ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন

ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি

পৃষ্ঠপোষক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় • ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য নিয়ে গ্রন্থ ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রদর্শনী আয়োজনের কাজ করে যাচ্ছে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি। বিগত ২০১০ সালে প্রকাশিত 'ঢাকার শিলালিপি' শীর্ষক কমিটির প্রথম প্রতিবেদন ঢাকার ইতিহাস ও শিলালিপি চর্চার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় একটি রেফারেন্সে পরিণত হয়েছে। কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন 'ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি' ঢাকার ইতিহাস ও শিলালিপি চর্চায় অনেক নতুন উপাদান যুক্ত করবে।

প্রথম প্রতিবেদন 'ঢাকার শিলালিপি'তে তখন পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া প্রাচীন অগ্রস্থিত শিলালিপির আলোকচিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। শিলালিপি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছিল। শিলালিপি চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল প্রথম প্রতিবেদনে।

যে সকল শিলালিপির বর্তমানে অস্তিত্ব রয়েছে, শুধু সেগুলোর খোঁজ নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপের জন্যে প্রয়োজন নিখোঁজ শিলালিপির খোঁজ নেয়া- এ উপলব্ধি থেকে কমিটি নিখোঁজ শিলালিপির খোঁজ নিতে তৎপর হয়। কমিটির একদল মাঠকর্মী ঢাকার প্রাচীন প্রায় সকল মসজিদ, মাজার, মন্দির, আখড়া, মঠ, গির্জা ও কবরস্থানে গিয়ে শিলালিপির খোঁজ করেছে। নিখোঁজ শিলালিপির খোঁজ করেছে। সরকারি উদ্যোগে তৈরি করা শিলালিপির অনুলিপির খোঁজ করেছে। খোঁজ নিয়েছে অপ্রকাশিত শিলালিপির সন্ধান ও প্রকাশ পাওয়ার ঘটনা।

প্রাচীন স্থাপত্য জরিপ, প্রদর্শনী আয়োজন এবং গ্রন্থ ও প্রতিবেদন তৈরির কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ এবং ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, স্থাপত্য, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক, দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, স্থপতি, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, চার্চের যাজক, মাদ্রাসার শিক্ষক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষকরা।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি ঢাকার শিলালিপিসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চায়। প্রথমে এশীয় ভাষার শিলালিপি নিয়ে দু'টি বই প্রকাশ হবে। কমিটির এশীয় ভাষার শিলালিপি সম্পাদনা পষিদের ৬২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ২০০৯ ও ২০১০ সালে ৩টি এবং ২০১১ সালের জানুয়ারির পর ৪৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ দু'টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। গ্রন্থ দু'টি এ বছর প্রকাশের চেষ্টা চলছে। চলছে ইউরোপীয় ভাষার শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সম্পাদনার প্রস্তুতি। এশীয় ভাষার শিলালিপি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর 'ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য' শীর্ষক বিষয়ে কমিটি পরবর্তী প্রতিবেদন তৈরি করবে। 'ঢাকায় স্থাপত্য : প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আমল' শীর্ষক বিষয়ে স্থাপত্য নকশা, চিত্রকর্ম ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে কমিটির, চলছে প্রস্তুতি।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছে। শিলালিপির খোঁজ নেয়ার সময় সহায়তা লাভ করছে ঢাকার বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদ, মন্দির, মাজার, চার্চ ও কবরস্থান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। কমিটির মাঠকর্মীদের সহায়তা করেছে ঢাকার স্থানীয় জনগণ। সহায়তা দানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

(অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক)

চেয়ারম্যান
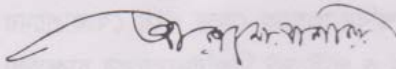
ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি ঢাকার বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্য থেকে যেসব মূল্যবান দলিলের সন্ধান পেয়েছে, তাতে আমি আনন্দিত। কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন 'ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি'তে ২৩টি নিখোঁজ শিলালিপির অপ্রকাশিত পাঠ প্রকাশ করা হলো। বাংলাদেশে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির শিলালিপি বিষয়ক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য নিয়ে গ্রন্থ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রদর্শনী আয়োজনের কাজ করছে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি। ইতোমধ্যে কমিটির উদ্যোগে 'ঢাকার শিলালিপি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং 'ঢাকার স্থাপত্য : প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আমল' শীর্ষক অনুবাদসহ আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলছে এশীয় ভাষার শিলালিপি নিয়ে দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ণের কাজ। ঢাকার এশীয় ভাষার শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধার, উচ্চারণ ও অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পর গত ৪ বছর ধরে চলছে সম্পাদনা। বাংলাদেশের আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী ধারার পণ্ডিত-গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী এ পর্যন্ত ৬২টি সভা করেছে। মুঘল, নবাবী ও কোম্পানি আমলের শিলালিপির সম্পাদনা শেষ হয়েছে। এখন চলছে ব্রিটিশ আমলের শিলালিপির সম্পাদনা।

শিলালিপি জরিপ, আলোকচিত্র গ্রহণ, অনুবাদ, সম্পাদনা, শিলালিপি গ্রন্থিত করার কাজে যুক্ত সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া)
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ঢাকার এশীয় ভাষার শিলালিপি বিষয়ক গ্রন্থ

ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি নিখোঁজ শিলালিপি বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে ২০১০ সালে। ঢাকা শহরে বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন শিলালিপি বিষয়ে জরিপ কাজ তখন শেষ পর্যায়ে। জরিপ শুরুর সময় শিলালিপি আছে এবং নেই- এই দু'টি শ্রেণীতে স্থাপনাগুলোকে ভাগ করা হচ্ছিল। কিন্তু জরিপ কাজের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা স্থাপনাগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে শুরু করি। শিলালিপি আছে, নেই এবং আরো গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। জরিপের প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকার কোন মসজিদ বা মাজার থেকে বলা হয়নি, তাদের শিলালিপি নিখোঁজ। কিছু কিছু স্থাপনা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ শিলালিপি নেই বলে জানিয়ে দিলেও তাদের কথাবার্তা ও আচরণে আমাদের মনে হতে থাকে, এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ঢাকার ১০০টি প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি। ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কমিটি এবং একই বছর কমিটি ঢাকার শিলালিপি বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকার অধিকাংশ শিলালিপির কথা গ্রন্থে উল্লেখ নেই। আবার গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও পাঠোদ্ধার করা হয়নি অনেক শিলালিপির। বিভিন্ন ভাষার

শিলালিপির পাঠোদ্ধার, উচ্চারণ ও অনুবাদ সম্পাদনা করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা সময়সাপেক্ষ একটি অ্যাকাডেমিক কাজ। কমিটি ঢাকার সকল শিলালিপির পাঠোদ্ধার, উচ্চারণ ও অনুবাদ সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের

সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রন্থে উল্লেখ নেই এমন সব শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু হয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভার কাজ। ২০০৯ সালের ১৬ অক্টোবর ও ১৯ অক্টোবর ও ২০১০ সালের ২২ জানুয়ারি সম্পাদকমণ্ডলীর তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সম্পাদনা কাজে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে।

তৎকালীন সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক এনামুল হক সম্পাদিত একটি বই সংগ্রহের তাগিদ দিয়ে বলেন, বইটিতে কমিটির উদ্যোগে জরিপকালে প্রাপ্ত এবং পাঠোদ্ধার ও অনুবাদের পর সম্পাদনা পরিষদের সভায় চূড়ান্ত করা নতুন কিছু শিলালিপি প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সম্পাদনা পরিষদের কোন সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের উদ্যোগে গঠন করা হয় পূর্ণাঙ্গ সম্পাদকমণ্ডলী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি, ফারসি, ইসলামিক স্টাডিজ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষকসহ আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী ধারার গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী গত তিন বছর ধরে শিলালিপির অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ নিরলসভাবে করে যাচ্ছেন।

২০১০ সালের ২৭ আগস্ট কমিটির প্রথম প্রতিবেদন 'ঢাকার শিলালিপি' প্রকাশিত হয়। এতে কমিটির উদ্যোগে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঢাকার ৬৩টি অপ্রকাশিত শিলালিপির আলোকচিত্র প্রকাশ করা হয়। কমিটির প্রথম প্রতিবেদনে মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক রচিত এবং এনামুল হক সম্পাদিত গ্রন্থটি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, *শিলালিপি খুঁজে পাওয়ার সত্যতার বিষয়টি নিয়ে আমরা আরো অনুসন্ধান চালাবো এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।*

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, ২০০৯ সাল পর্যন্ত ড. এনামুল হক বা তার প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ ঢাকায় নতুন শিলালিপির সন্ধান পাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির জরিপে নতুন শিলালিপি সন্ধান পাওয়ার পর ২০১০ সাল থেকে এনামুল হক তার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে নতুন শিলালিপির কথা উল্লেখ করছেন। ২০১১ সালে কমিটির হাতে এনামুল হক সম্পাদিত জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট-এর একটি প্রবন্ধের কপি আসে। মুহম্মদ আবদুল কাদিরের লেখা এ প্রবন্ধে ঢাকার কিছু শিলালিপির নাম লেখা, যেগুলো ইতিপূর্বে কমিটির প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল।

এনামুল হকের প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন শিলালিপি আবিষ্কারের বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় কমিটি। কমিটির সদস্যরা ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় মসজিদ, মাজার, মন্দির, গির্জা, কবরস্থানে গিয়ে নিখোঁজ শিলালিপির অনুসন্ধান চালায়। কোথা থেকে, কবে থেকে নিখোঁজ, কোন স্থানে স্থাপন করা ছিল, পাথরের রং কি, ভাষা কি ছিল ইত্যাদি।

প্রায় চার বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে কমিটি নিশ্চিত হয়েছে, গত ৩০ বছরে ঢাকার শতাধিক প্রাচীন শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে। বেশিরভাগ শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দির নব্বইয়ের দশকের পর।

ঢাকার শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে খুব কম। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন গ্রন্থে ঢাকার ১০টি শিলালিপি নিখোঁজের কথা উল্লেখিত রয়েছে।

ঢাকার ইতিহাস

ঢাকার শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা প্রথম লিপিবদ্ধ হয় যতীন্দ্রনাথ রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' বইতে। ১৩১৯ বাংলা সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে রাজধানী ঢাকার ৭টি শিলালিপির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ রায় চম্পাবিবির মাজারের শিলালিপি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার ১১টি প্রাচীন স্থাপনার বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলোতে শিলালিপি বিষয়ক কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

চম্পা বিবির মাজারের শিলালিপি

ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন চম্পা বিবির মাজারের অবস্থান চকবাজার থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে চম্পাতলী মহল্লায় ছোট কাটরার উত্তরদিকে ১২/১ হাকিম হাবিবুর রহমান রোডে জনশ্রুতি অনুযায়ী, চম্পাবিবির নাম অনুসারে মহল্লাটির নাম হয়েছে চম্পাতলী। তবে চম্পা বিবি কে ছিলেন এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, চম্পা বিবি সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা। আবার কেউ কেউ মনে করেন, শায়েস্তা খানের প্রিয় দাসী ছিলেন চম্পা।

চম্পা বিবির মাজারে শিলালিপি নিরুদ্দেশের উল্লেখ আছে 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থটিতে। গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, *'প্রাচীর পরিবেষ্টিত আঙ্গিনার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিবি চম্পার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে, এই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশের উপরিভাগে একখানা শিলালিপি বর্তমান ছিল। উহা ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় বলিয়া শিলালিপিতে লিখিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে শিলালিপি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিবি চম্পা কে ছিলেন তা জানা যায় না।'*

'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হলেও কখন থেকে সেটি নিখোঁজ এ বিষয়ে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। অন্য সূত্র থেকেও এ নিয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। শিলালিপিটির কোন পাঠও পাওয়া যায়নি।

তাওয়ারীখে ঢাকা

মুন্সী রহমান আলী তায়েশ-এর 'তাওয়ারীখে ঢাকা' ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উর্দু ভাষায় লেখা এই গ্রন্থে লেখক ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। এতে উল্লেখ আছে ঢাকার ৪টি শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা। 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখিত নিখোঁজ শিলালিপিগুলো হচ্ছে ইসলাম খান মসজিদের শিলালিপি, কারতলব খান মসজিদের শিলালিপি, সাতগম্বুজ মসজিদের শিলালিপি ও দারা বেগমের মাজারের শিলালিপি।

ইসলাম খান মসজিদের শিলালিপি

ইসলাম খান মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে। বর্তমানে কোতোয়ালি থানার ইসলামপুর মহল্লায় ৩৮ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে মসজিদটির অবস্থান। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন এই মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, ইসলাম খান ঢাকায় এসে যে স্থানে আবাস স্থাপন করেন, সে অঞ্চলটি ইসলামপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। সেখানে তিনি নির্মাণ করেন মসজিদ, যা পরিচিতি লাভ করে ইসলাম খান মসজিদ হিসেবে।

মসজিদটি সম্পর্কে 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, *'একে ঢাকা শহর পত্তনকালের প্রাচীন ইমারত বলা হয়ে থাকে। এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি পুরনো রীতির মসজিদ, যা শায়েস্তখানী রীতি থেকে ভিন্ন ধরনের। তার শিলালিপি কে উপড়িয়ে ফেলেছে তা জানা যায়নি।'*

শিলালিপিটি কবে থেকে নিখোঁজ এ বিষয়ে গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোন সূত্র থেকেও এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

কারতলব খান মসজিদের শিলালিপি

বেগমবাজার বড় মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে। কারতলব খান মসজিদ নামেও মসজিদটির পরিচিতি। এটির

বর্তমান অবস্থান বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে ৬২ বেগমবাজার রোডে।

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ১৭০১ থেকে ১৭০৪ সালে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান ওরফে কারতলব খান এটি নির্মাণ করেন। কোম্পানি আমলে মীর্জা গোলাম পীর মসজিদটির সংস্কার করেন। পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি ছিল তৎকালীন মুঘল রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে বড় মসজিদ। মসজিদটি দোতলা। নিচতলায় দোকান এবং দোতলায় প্রার্থনা কক্ষ।

'তারীখে নুসরতজঙ্গী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, *এই মসজিদের সাথে একটি বাজার ওয়াকফ্ করা ছিল। মুর্শিদকুলী খানের বংশের হাজী বেগম বিনতে গজনফর আলী ছিলেন একসময় মোতাওয়াল্লি। তার নামেই বেগমবাজার নাম হয়েছে।*

'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেন, *এটা জানা যায়নি যে, এর শিলালিপির কি হলো, তাই নির্মাণের তারিখ জানা সম্ভব হলো না।*

শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হলেও কবে থেকে নিখোঁজ এ বিষয়ে কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোন সূত্র থেকে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

দারা বেগমের মাজারের শিলালিপি

রাজধানী ঢাকার জাঁকজমকপূর্ণ মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন দারা বেগমের মাজারের শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে। দারা বেগমের মাজারসৌধকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে, যা বর্তমানে পরিচিত বিবির মসজিদ নামে, দাপ্তরিক নাম লালমাটিয়া শাহী মসজিদ। দারা বেগমের মাজারের বর্তমান অবস্থান মোহাম্মদপুর থানায়, হোল্ডিং নাম্বার ৬/২৫ লালমাটিয়া, ব্লক এফ।

অঞ্চলটি আগে জাফরাবাদের বেগমপুর সরাই নামে পরিচিত ছিল। পরিকল্পিত নগরায়ন করার পর অঞ্চলটির নাম দেওয়া হয় লালমাটিয়া। দারা বেগম কে ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, তিনি শায়েস্তা খানের কন্যা ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দারা বেগম- শায়েস্তা খানের আগের কোন সুবেদারের স্ত্রী।

মুন্সী রহমান আলী তায়েশ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, *সমাধির আড়ম্বর ও জাঁকজমক দেখে মনে হয়, তিনি কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রী বা কন্যা ছিলেন। এটি একটি বড় গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি।* গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়, *সমাধির শিলালিপির কী হলো জানা যায়নি। ফলে নির্মাণের তারিখ প্রভৃতি উদ্ধার করা যায়নি।*

শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হলেও কবে থেকে নিখোঁজ এ বিষয়ে কোন উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোন সূত্র থেকে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

সাত গম্বুজ মসজিদের শিলালিপি

মোহাম্মদপুর এলাকার সাতগম্বুজ মসজিদের শিলালিপির নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে। ইতিহাসবিদদের মতে, শায়েস্তাখানী স্থাপত্য রীতির অন্যতম নির্দশন সাতগম্বুজ মসজিদটি শায়েস্তা খান নির্মাণ করেছিলেন।
মসজিদের তিনটি গম্বুজ নামাজ কক্ষের উপর এবং চারকোণায় রয়েছে চারটি গম্বুজ। তাই মসজিদটি সাতগম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত।

অঞ্চলটি পূর্বে জাফরাবাদের বাঁশবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। জাফরাবাদের পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো একটি নদী। মুঘল ঢাকার পশ্চিমদিকের প্রান্তীয় অঞ্চল ছিল জাফরাবাদ। ঢাকা থেকে মুঘল রাজধানী স্থানান্তরের পর জাফরাবাদ অঞ্চল এবং মসজিদটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। পরিত্যক্ত মসজিদটি আবার আবাদ শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। পাকিস্তান আমলে পরিকল্পিত নগরায়নের পর মোহাম্মদপুর নামকরণ করা হয়।

'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, *'শিলালিপির কী হলো তা জানা যায়নি। কয়েক বছর আগে ঢাকার নবাব স্যার আহসানউল্লাহ বাহাদুর এ মসজিদ নতুনভাবে মেরামত করে দেন এবং মুয়াজ্জিনও ঠিক করে দেন। এতে মসজিদ আবাদী হয়ে উঠে এবং পাঁচবেলা আযান ও নামাজ চলে।'*

সাতগম্বুজ মসজিদের শিলালিপি সম্পর্কে অন্য কোন সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

আল্লাকুড়ি মসজিদের শিলালিপি

সাত মসজিদ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে মুঘল আমলে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদটি আল্লাকুড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। তবে মসজিদটির বর্তমান দাপ্তরিক নাম আল্লাকরিম জামে মসজিদ। বিংশ শতাব্দির শুরুতে
আল্লাকুড়ি মসজিদের শিলালিপিটি ভাওয়ালের জমিদার নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ রয়েছে।
শিলালিপি না থাকায় মসজিদটির নির্মাণকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ জানা যায় না। তবে প্রাচীন কাঠামোর গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্যকৌশল দেখে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন, শায়েস্তা খানের আমলে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

অঞ্চলটির আগে নাম ছিল কাটাসুর গ্রাম। উঁচু ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশে ছিল মসজিদের প্রার্থনা কক্ষ। শিলালিপিটি মসজিদের পূর্বদিকের প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল। মসজিদের আদি কাঠামো বর্তমানে নেই। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আদি কাঠামো ভেঙ্গে নতুন বহুতল ভবন তৈরি করা হয়েছে।

আল্লাকুড়ি মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজের কথা উল্লেখ করেছেন ড. আহমদ হাসান দানী তাঁর 'ঢাকা এ রেকর্ড অব ইট'স চেঞ্জিং ফরচুনস' শীর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-২১৬) উল্লেখ করা হয়, *'দ্য ডোরওয়ে ওপেন্স বিলো এ সেমি ডোম ওভার হুইচ ওয়াজ ফরমার্লি প্লেইসড অ্যান ইন্সক্রিপশন। ইট ইজ রিপোর্টেড দ্যাট দ্য ইন্সক্রিপশন ওয়াজ রিমুভড বাই দ্য রাজা অব ভাওয়াল ইন দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি।'*

আল্লাকুড়ি মসজিদের শিলালিপি সম্পর্কে অন্য কোন সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

শাহ বৈরমের মাজারের শিলালিপি

হাকিম হাবিবুর রহমানের মতে, নড়াই নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ৩টি মাজার প্রাক মুঘল আমলের। মাজার তিনটি হচ্ছে ইস্কাটনের দিলু রোডে করাট শাহ-এর মাজার, এফডিসি সংলগ্ন পন্থী শাহ-এর মাজার এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে বৈরম শাহ-এর মাজার। এর মধ্যে বৈরম শাহ-এর মাজারের শিলালিপি নিখোঁজ। বৈরাম শাহ-এর মাজারের বর্তমান অবস্থান তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার কলোনিবাজারে, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খেলার মাঠ সংলগ্ন পশ্চিম দিকে।
১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'আসুদগানে ঢাকা' বইতে শাহ বৈরম সম্পর্কে হাকিম হাবিবুর রহমান বলেছেন: *এ ধরনের নাম আফগান আমলে প্রচলিত ছিলো। এটা জানা গেছে যে, তার মাযারে একটি শিলালিপি ছিলো। কিন্তু এখন তার হদিস পাওয়া যায় না।*

তবে কবে কিভাবে এটি নিখোঁজ হয়েছে 'আসুদগানে ঢাকা' বইতে তার উল্লেখ নেই। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ। বর্তমান মাজার কমিটিও এ বিষয়ে কিছু জানে না বলে জানিয়েছে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে। বর্তমানে ইট-সিমেন্টের নতুন ভবন উঠেছে মাজারের জায়গায়।

ইস্কাটনের দিলু রোডে করাট শাহের মাজার এবং এফডিসি সংলগ্ন পন্থী শাহের মাজারে কোন শিলালিপি ছিল কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা

'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা' গ্রন্থে ৩টি মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মসজিদ তিনটি হচ্ছে রমনা থানা মসজিদ, কলতাবাজার ছোট মসজিদ ও কদম রসুল মসজিদ।

মোঃ আবদুর রশিদের লেখা এ গ্রন্থটি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ঢাকা নগরীর প্রায় ১৩০০ মসজিদের ঠিকানা ও বিররণ উল্লেখ করা হয়েছে।

কদম রসুল মসজিদের শিলালিপি

গেন্ডারিয়া এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেললাইনের পশ্চিমপাশে কদম রসুল মসজিদের অবস্থান। রসুলের পায়ের ছাপ সমন্বিত পাথরখণ্ড থেকে মসজিদের নাম হয়েছে কদম রসুল মসজিদ। উনিশ শতকে রেললাইন স্থাপন করার সময় পাওয়া গিয়েছিল মসজিদটি। আর তাই স্থানীয়ভাবে কদম রসুল নামের পাশাপাশি গায়েবী মসজিদ নামেও মসজিদটির পরিচিতি রয়েছে।

মুঘল প্রাদেশিক রাজধানী স্থানান্তরের পর গেন্ডারিয়া অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকে অঞ্চলটি জঙ্গলে পরিণত হয়। ব্রিটিশ আমলে রেললাইন স্থাপনের লক্ষ্যে শুরু হয় গাছপালা কাটা। জনশ্রুতি অনুযায়ী,

কাটতে গিয়ে এক পর্যায়ে মসজিদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে মসজিদটি নামাজের উপযোগী করে তোলা হয়। তবে উনিশ শতকের কোন সালে মসজিদটি পাওয়া গিয়েছিল, তার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা যায় না। মসজিদটির বর্তমান অবস্থান গেন্ডারিয়া থানায় ৮৯ নম্বর ডিস্টিলারি রোডে।

রসুলের পায়ের ছাপ থাকার কারণে মসজিদটি তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে আসছে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে। স্থানীয় মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের সকাল বেলায় বিশেষত শুক্রবারে গোছল সেরে ভেজা কাপড়ে এসে পাথরখণ্ডে শ্রদ্ধা জানানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। মসজিদে আসতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানত। সম্প্রতি পাথরখণ্ডটি মসজিদ থেকে সরিয়ে মোতাওয়াল্লি পরিবারের কাছে রাখা হয়েছে।

'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশনা' গ্রন্থে মসজিদটি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, *'এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা মসজিদ। নির্মাণ তারিখসহ প্রস্তরফলক নিখোঁজ হয়ে গেছে। পুরানো মসজিদ।'*

মসজিদের শিলালিপি সম্পর্কে অন্য কোন সূত্র থেকে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

গেন্ডারিয়ার প্রবীণ বাসিন্দা সারোয়ার ভান্ডারি নামাজ পড়েছেন কদম রসুল মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর ভেতরে। মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো সম্পর্কে সারোয়ার ভান্ডারী বলেন, 'মসজিদটির ছাদ ছিল না। ছিল একটি গম্বুজ। চারপাশের দেয়ালের সঙ্গে গম্বুজটি সংযুক্ত ছিল। গম্বুজের চারপাশে তেমন আর কিছু ছিল না। মসজিদের দেয়ালগুলো ছিল একটু বাঁকানো।'

মগবাজার মসজিদের শিলালিপি

বিগত শতাব্দির সত্তরের দশকের পর হারিয়ে যায় মুঘল স্থাপত্য মগবাজার মসজিদের শিলালিপি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে রমনা থানা চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মসজিদটির অবস্থান।

চার্লস ড'য়লীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ঢাকা'য় রয়েছে মসজিটির এক গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন কাঠামোর ছবি। মুঘল ঢাকার বিভিন্ন স্থাপত্যের ছবি এঁকেছিলেন ড'য়লী। লিখেছিলেন ঢাকা ও ঢাকার স্থাপত্য সম্পর্কে এক অসাধারণ বিবরণ। আঠার শতকের প্রথম দিকে প্রকাশিত ড'য়লীর গ্রন্থে মসজিদটিকে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এ মসজিদ অন দ্যা মগবাজার রোড, ঢাকা' হিসেবে।

'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা' গ্রন্থে মসজিদটিকে উল্লেখ করা হয়েছে 'রমনা থানা মসজিদ' হিসেবে।

গ্রন্থটিতে মসজিদটি সম্পর্কে বলা হয়, *'এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা মসজিদ। মূল অংশ খুব ছোট। দরজায় প্রস্তর লিপি ছিল। বর্তমানে নিখোজ। পরবর্তী সময়ে সম্প্রসারিত করা হয়। মূল মসজিদ মুঘল স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত।'*

রমনা থানা মসজিদ ও অঞ্চলটি সম্পর্কে হাশেম সূফী জানান, মসজিদটির নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয়েছে। মহল্লাটি আগে পাংখাটুলী নামে পরিচিত ছিল। আর মসজিদটির নাম ছিল পাংখাটুলী মসজিদ। ব্রিটিশ আমলে মহল্লাটির নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এলাকাটি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়। বেইলি রোড ও ইস্কাটন এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ এটি। শৈশব থেকে তিনি দেখে আসছেন, মসজিদটিতে নামাজ পড়তে আসতেন পদস্থ কর্মকর্তারা।

হাশেম সূফী আরো জানান, মসজিদের প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। পাথরের রং ছিল কালো এবং ভাষা ছিল ফারসি। মুক্তিযুদ্ধের পরেও মসজিদের দেয়ালে স্থাপন করা অবস্থায় শিলালিপিটি দেখা গেছে।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী জানান, উন্মুক্ত চত্বরের মাঝখানে মসজিদটি খুব সুন্দর দেখাতো। শায়েস্তা খানী রীতিতে নির্মিত মসজিদটিতে শিলালিপি আমি দেখেছি।

কলতাবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি

কলতাবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে গত শতাব্দির আশির দশকের পর। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ। হাজী আবদুল মজিদ লেন মসজিদ নামেও মসজিদটির পরিচিতি রয়েছে। মসজিদটির বর্তমান অবস্থান সূত্রাপুর থানায় সিটি (দক্ষিণ) করপোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে ৮৫ হাজী আবদুল মজিদ লেনে।

ঢাকা শহরের পুরানো বসতিগুলোর অন্যতম এ মহল্লার পশ্চিমে ঢাকা জেলা জজকোর্ট, দক্ষিণে লক্ষ্মীবাজার। পূর্ব দিকে এ মহল্লার অনতিদূর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে দোলাইখাল। ভিক্টোরিয়া পার্ক হিসেবে

পরিচিত আন্টাঘর ময়দানের অবস্থান কলতাবাজারের পশ্চিম-দক্ষিণে।

'কিংবদন্তির ঢাকা' বইতে নাজির হোসেন বলেছেন, এক সময় বরফকল ছিলো এখানে। ব্রিটিশ আমলে সেই বরফকলের ব্যবসা পড়ে এলেও কল শব্দের সঙ্গে বাজার জুড়ে কলতাবাজার নামটা রয়ে যায়। ব্রিটিশ আমলে কলতাবাজারের একটি অংশের নামকরণ করা হয় হাজী আবদুল মজিদ লেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ নির্দেশিকা বইতে বলা হয়েছে, দরজার প্রস্তরলিপি নিখোঁজ। আদি মসজিদে গম্বুজ ছিল। ব্রিটিশ শাসন আমলে আদি মসজিদটি ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন করে নির্মাণ করা হয়।

গবেষক হাশেম সূফী জানান, আনুমানিক ১৮৭১ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন হাজী আবদুল মজিদ ওরফে মজু ওস্তাগর। সাদা পাথরে লেখা শিলালিপিটির ভাষা ছিল ইংরেজি।

গ্রন্থে আছে, বর্তমানে নিখোঁজ

মুঘল ঢাকার দ্বিতীয় প্রাচীন শিলালিপি হোসেনী দালানের শিলালিপির কথা উল্লেখ আছে ঢাকা বিষয়ক প্রায় সকল গ্রন্থে। ২০০৫ সালের পর থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ। গ্রন্থে শিলালিপির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু অনুসন্ধানকালে পাওয়া যায়নি ঢাকার এমন শিলালিপির সংখ্যা ১৫টি। 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে মীর্জা গোলাম পীরের মাজারের শিলালিপি, মুন্সী ইনায়েত আলীর মাজারের শিলালিপি, মুন্সী মুতাসিম বিল্লাহর মাজারের শিলালিপি, খাজা আলিমউল্লাহর মাজারের শিলালিপি ও শাহ নূরীর মাজারের শিলালিপির পাঠ রয়েছে। উল্লেখিত ৫টি শিলালিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে আছে সিদ্দিকবাজার মীর গোলাম মোস্তফার মাজারের শিলালিপি, হিব্রু ভাষার শিলালিপি ও নরসিং শাহের মাজারের শিলালিপির কথা। নিখোঁজ উল্লেখিত ৩টি শিলালিপি। নাজির হোসেন তার 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন শিখ সঙ্গতের শিলালিপি, আমলিগোলা বড় মসজিদের শিলালিপি ও রোকন উদ্দীন চিশতীর মাজারের শিলালিপি। পাওয়া যায়নি 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখিত শিলালিপি। গুরুদুয়ারার কূপ, আরমানিটোলা সবুজ মসজিদের শিলালিপি ও সিংটোলা মসজিদের শিলালিপি ও হোসেনী দালানের শিলালিপির কথা উল্লেখ আছে বিভিন্ন গ্রন্থে।

হোসেনী দালানের শিলালিপি

ঢাকার আলোচিত শিলালিপিগুলোর অন্যতম হোসেনী দালানের শিলালিপি। সৈয়দ আওলাদ হোসেন, মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, এস এম তৈফুর, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ড. আবদুল করিমসহ বিভিন্ন পণ্ডিতজন ঢাকার ইতিহাস ও শিলালিপি বিষয়ক গ্রন্থে হোসেনী দালানের শিলালিপি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিলালিপির পাঠ উল্লেখ করেছেন। ঢাকায় প্রাপ্ত মুঘল আমলের শিলালিপিসমূহের মধ্যে কাল অনুসারে এটি দ্বিতীয়। শিলালিপিটি বর্তমানে নিখোঁজ। বিভিন্ন সময়ে হোসেনী দালান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৫ সালের সংস্কারের পর থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ।

হোসেনী দালানের অবস্থান ঢাকা মেডিকেল কলেজের দক্ষিণদিকে হোসেনী দালান রোডে। হোসেনী দালান শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়া, ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান উপাসনা কেন্দ্র। শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায়, ১০৫২ হিজরি (১৬৪২-৪৩ খ্রি.) সনে বাঙলার সুবাদার সুলতান শাহ সুজার নৌ সেনাপতি মীর মুরাদ এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। হোসেনী দালানের পূব দিকের দেয়ালে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। এটির কোন আলোকচিত্র খোঁজ করে পাওয়া যায়নি।

হোসেনী দালানের শিলালিপিটির রং কালো। ভাষা ফারসি। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী প্রমুখ গবেষক বিগত শতাব্দীর আশির দশকে শিলালিপিটি স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন। হোসেনী দালান পরিদর্শনকালে বিভিন্ন সময়ে ভক্তরা জানিয়েছেন, ২০০৪ সাল পর্যন্ত তারা দালানের দেয়ালে শিলালিপি দেখেছেন।

কোম্পানি আমল, ব্রিটিশ আমলসহ বিভিন্ন সময়ে হোসেনী দালানের সংস্কার হয়েছে। সর্বশেষ সংস্কার হয় ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। এরপর থেকে শিলালিপিটি আর দেখা যাচ্ছে না। এটি কোথায় আছে এ বিষয়েও কোন তথ্য জানা যায়নি।

গুরু নানকের কূপের শিললিপি

গুরুদুয়ারার কূপে শিলালিপির অস্তিত্বের কথা বিভিন্ন গবেষক তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গুরু নানকের স্মৃতিজড়িত স্থান গুরুদুয়ারা নানকশাহীর কূপে ছিল পাঞ্জাবী ভাষার একটি শিলালিপি। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে গবেষকরা কূপে শিলালিপিটি স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন। এরপর থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ। গুরুদুয়ারা নানকশাহীর অবস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পশ্চিম দিকে।

ঐতিহ্য অনুযায়ী, গুরু নানক ঢাকায় অবস্থানকালে বেশ কয়েকটি স্থানে গিয়েছিলেন। এখানেও তিনি এসেছিলেন। এ ঘটনা স্মরণে এখানে গড়ে ওঠে গুরুদুয়ারা। নির্মিত হয় কূপ।

সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুরের 'গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, *দেয়ার ইজ এন ওল্ড ওয়েল দেয়ার উইথ এন ইন্সক্রিপশন স্ল্যাব অন ইট'স ল্যান্ডিং।*

মুনতাসীর মামুনের 'স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী' বইতে বলা হয়েছে: *এর প্রাঙ্গণে কুয়া, কয়েকটি সমাধি ও কোন এক গুরুর পদচিহ্নযুক্ত পাথর ছিলো। ১৯৪৭ সালের পর এটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে ফের সংস্কার করা হয়।*

আ ক ম যাকারিয়ার 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, *আলমাখত নামে এক শিখ গুরু সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-২৮) এটি নির্মাণ করেন। কূপের পাড়ে শিলালিপি ছিলো।*

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কমিটিকে জানান, বিগত শতাব্দির ষাটের দশকে তিনি গুরুদুয়ারার কূপে শিলালিপিটি স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন। গুরুমুখী অক্ষরে লেখা পাঞ্জাবি ভাষার শিলালিপি ছিল এটি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ইতিহাসবিদদের মতে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মূল প্রার্থনাকক্ষের পাশাপাশি কূপটিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কূপের স্থানটিকে বাদ দিয়েই গড়ে ওঠে বর্তমান গুরুদুয়ারার সীমানা প্রাচীর। নিখোঁজ হয়ে যায় শিলালিপি।

শিলালিপি বিষয়ে বর্তমান গুরুদুয়ারা পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ রবি দাস পাপ্পুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে তিনি জানান, এখানে কোন শিলালিপি তিনি দেখেননি। কখনও ছিলো বলে তিনি শোনেননি।

আরমানিটোলা সবুজ মসজিদের শিলালিপি

আরমানিটোলা সবুজ মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের পর। ১১০৮ হিজরি/ ১৬৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিবি সাহেবা দওলত মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির বর্তমান অবস্থান বংশাল থানায় ৯৮ শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী রোডে।

আরমানিটোলা সবুজ মসজিদের শিলালিপিটি মসজিদের প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল। পাথরের রং ছিল কালো। শিলালিপিটির প্রথম তিন লাইন আরবি ভাষায় কোরানের আয়াত এবং পরবর্তী অংশের ভাষা ফারসি।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তার 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে মসজিদটিতে শিলালিপি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, বিগত শতাব্দির আশির দশকে তিনি মসজিদটি পরিদর্শন করেন এবং শিলালিপিটি তখনও মসজিদে স্থাপন করা ছিল।

মসজিদের ইমাম মওলানা আবদুস সালাম জানান, ১৯৭৩ সাল থেকে মুয়াজ্জিন এবং ১৯৭৭ সাল থেকে ইমাম হিসেবে তিনি মসজিদটিতে কাজ করছেন। শিলালিপি নিখোঁজ হওয়া বিষয়ে মসজিদের ইমাম জানান, তার আগে যিনি ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি শিলালিপিটি খুলে রেখেছিলেন। প্রায় ২০ বছর আগে একটি সংস্থা থেকে কয়েকজন লোক এসে শিলালিপি নিয়ে যায়। তারা তখন একটি মেমো দিয়ে গিয়েছিল, যা হারিয়ে গেছে।

হিব্রু ভাষার শিলালিপি

হাকিম হাবিবুর রহমানের লেখা গ্রন্থে ঢাকায় একটি হিব্রু ভাষার শিলালিপি ছিল বলে উল্লেখ আছে। তাঁর লেখা 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'এমনি একটি কবর ছিল নওয়াব নুসরাত জং-এর ঘোড়ার চাদমারির টেকে। লোকেরা উহাতে ফাতেহা পাঠ করতো। বর্তমানে সে কবরটি টেকের উপরে পশ্চাতে বাড়িগুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আরো মজার ব্যাপার এই যে, এর কাছেই ছিল আরো একটি পাকা কবর। লোকেরা উহাতে ফাতেহা পাঠ করতো এমনকি ফুলও দিতো। অথচ এটি ছিল জনৈক

ইহুদির কবর। তার শিয়রে একটি পাথর ছিল উহাতে হিব্রু ও ইংরেজীতে লেখা ছিল সমাহিতের নাম। আরো লেখা ছিল ঢাকায় ইহুদিদের আলাদা কবরস্থান না থাকাতে তাকে এখানে কবরস্থ করা হলো। নির্মিত কবরের পাশেই দক্ষিণ দিকে তার ভক্তেরা বাস করতো।'

ঢাকার হিব্রু ভাষার শিলালিপিটি বর্তমানে নিখোঁজ। কবে থেকে নিখোঁজ এবং শিলালিপিটি কোন স্থানে ছিল এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার সময় ঢাকা ৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। গ্রন্থে ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মাজারের আলোচনায় হিব্রু ভাষায় শিলালিপির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থে উল্লেখিত বিগত শতাব্দির চল্লিশের দশকের ৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা লালবাগ ও হাজারীবাগ অঞ্চলে খোঁজ নিয়ে আরো জানা গেছে, ঢাকার কোন অঞ্চল এখন 'নওয়াব নুসরাত চাঁদের ঘোড়ার চাদমারির টেক' বলে পরিচিত/উল্লেখিত হয় না। নামটি হারিয়ে গেছে।

হাকিম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থে ওয়ার্ড এবং নওয়াব নুসরাত জং-এর ঘোড়ার চাদমারির টেক' ছাড়া শিলালিপির স্থানটির আর কোন বিবরণ নেই। গ্রন্থে শিলালিপিটির পাঠ উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোন সূত্র থেকেও শিলালিপিটির কোন পাঠ পাওয়া যায়নি।

নওয়াব নুসরাত জং-এর ঘোড়ার চাদমারির টেকের অবস্থান বিষয়ে লেখক ও গবেষক মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সরেজমিনে অনুসন্ধান করেন। তিনি জানান, ঢাকায় দু'টি চাদমারি ছিল। একটি নবাবগঞ্জে এবং অপরটি আজিমপুর এলাকায়। নওয়াব নুসরাত চাঁদের ঘোড়ার চাদমারির টেকের অবস্থান ছিল আজিমপুরের বর্তমানে চায়না বিল্ডিং বলে পরিচিত এলাকায়। মওলানা ফতেহ্‌পুরী আরো জানান, আজিমপুরের চায়না বিল্ডিং এলাকার পরিবেশ বদলে গেছে। টেক মানে উচুঁ জায়গা। আজিমপুরের চায়না বিল্ডিং এলাকায় এখন আর কোন টেক নেই। সমতল হয়ে গেছে।

শাহ ফরিদের মাজারের শিলালিপি

সূত্রাপুর থানা চত্বরে অবস্থিত শাহ ফরিদের মাজারে প্রাচীন একটি মসজিদের শিলালিপি ছিল। বিগত শতাব্দির চল্লিশের দশকে লেখা হাকিম হাবিবুর রহমানের 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ আছে। শিলালিপিটি এখন নিখোঁজ এবং এর কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি শিলালিপিটি কবে থেকে নিখোঁজ।

থানার মূল ভবনের পশ্চিম দিকে শাহ ফরিদের মাজার। শাহ ফরিদ কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ফরিদাবাদ মহল্লার নামকরণ হয়েছে শাহ ফরিদের নামে। গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়: *কবরের পাশে একটি ফলক রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে, 'চান্দ ইবনে কবীর রহিমদাদ ১১১৩ হিজরিতে মসজিদটি নির্মাণ করেছেন।*

হাকিম হাবিবুর রহমানের মতে, শাহ ফরিদের মাজারে রক্ষিত শিলালিপিটি হয়তো অন্য কোন মসজিদের। মসজিদ থেকে মাজারে এনে রাখা হয়েছিল।

ঢাকা গবেষক হাশেম সূফী এ বিষয়ে বলেন, শাহ ফরিদের মাজারে রক্ষিত মসজিদের শিলালিপিটি দক্ষিণ দিকের উলটিনগঞ্জ মহল্লার কোন মসজিদের হতে পারে। মাজারের দক্ষিণ পাশে মহল্লায় ছিল প্রাক মুঘল আমলের বেগ মুরাদের দুর্গ। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আশির দশক পর্যন্ত তিনি শাহ ফরিদের মাজারে রক্ষিত দু'টি শিলালিপি দেখেছেন। একটি ছিল মসজিদের শিলালিপি এবং অপরটি মাজারের শিলালিপি। আশির দশকে যখন দেখি, তখন দু'টি শিলালিপির মধ্যে মসজিদের শিলালিপির অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। শিলালিপি দু'টির ভাষা ছিল ফারসি।

নরসিংহ শাহের শিলালিপি

দিলখুশা মসজিদ লাগোয়া কবরস্থানে নরসিংহ শাহের সমাধি। বর্তমানে এর অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে, মতিঝিল থানায়। বিগত শতাব্দীর আশির দশকের পর শিলালিপিটি নিখোঁজ হয়।

নরসিংহ শাহের শিলালিপিটির পাঠ প্রথম ছাপা হয় 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে। মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দিন ফতেহ্‌পুরী ১৯৮৬ সালে সমাধিসৌধের দেয়াল থেকে সর্বশেষ এ শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করেন।

শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৩৩ হিজরি বা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে নরসিংহ শাহের মৃত্যু হয়।

হাকিম হাবিবুর রহমানের 'আসুদগানে ঢাকা' বইতে প্রকাশিত বর্ণনা অনুযায়ী, শাহজালাল দুকনী সাহেবের মসজিদের দক্ষিণ দিকে নেয়ামতউল্লাহ বুতশেকিনের মাজারের নতুন চার দেয়ালের মধ্যে নরসিংহ শাহের পাকা কবর। তিনি ফুলবাড়িয়ার কোন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন। তার দাদা চরণদীপ মিত্র ছিলেন খ্যাতিমান লোক।

নরসিংহ শাহ ছিলেন ফারসি পণ্ডিত। নিজের দেওয়ানখানায় তিনি বহু শিক্ষার্থীকে ফারসি পড়াতেন। তিনি সব সময় নিশ্চুপ থাকতেন।

খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আযম তার সমাধিসৌধের শিরোভাগে মর্মর পাথরে কবিতার মাধ্যমে মৃত্যুর তারিখ লিখে দেন।

আমলীগোলা বড় মসজিদের শিলালিপি

লালবাগ অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন মহল্লা আমলীগোলায় প্রাচীন মসজিদ রয়েছে দু'টি। এর মধ্যে আমলীগোলা ছোট মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে আছে। অন্যদিকে আমলীগোলা বড় মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ।

মুঘল আমলে গোলাহ আমীরগঞ্জ বা আমীরগোলা নাম ছিল এ এলাকার। কোম্পানি আমলে অঞ্চলটি আমলীগোলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২৭ সালে তৎকালীন পৌরসভা আমলীগোলার নতুন নাম রাখে জগন্নাথ সাহা রোড। তবে এ অঞ্চলটি এখনও আমলীগোলা হিসেবেই অধিক পরিচিত।

আমলীগোলা বড় মসজিদের বর্তমান অবস্থান ২৭ জগন্নাথ সাহা রোডে। মসজিদটি সম্পর্কে নাজির হোসেন তার 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: *আমলীগোলা বড় মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত হয়। এর ফলকটি লালবাগ কেল্লার জাদুঘরে রক্ষিত আছে। মসজিদটি উঁচু প্লাটফরমের উপর তৈরি বিধায় এটা দোতলা মসজিদের মতোই দেখা যায়। মসজিদের সৌন্দর্য ছিল বিরাটাকায় গম্বুজ। সেই গম্বুজ আর মিনার ভেঙ্গে দোতলা করায় মসজিদের সে সৌন্দর্য আর নেই। মসজিদটি মুঘল শাহী আমলে নির্মিত হয়েছিল বিধায় এটা আমলীগোলা শাহী মসজিদ নামে পরিচিত থাকলেও মহল্লার লোক এটাকে আমলীগোলা বড় মসজিদ নামেই অবহিত করে।*

আমলীগোলা বড় মসজিদের শিলালিপি লালবাগ কেল্লা জাদুঘরে রক্ষিত আছে বলে নাজির হোসেনের গ্রন্থে উল্লেখ করা হলেও লালবাগ কেল্লা জাদুঘরে খোঁজ করে সেখানে আমলীগোলা বড় মসজিদের শিলালিপি হিসেবে উল্লেখ করা কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। সেখানে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, যেটির পরিচয় দিতে গিয়ে 'লালবাগ এলাকা থেকে সংগৃহীত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে লালবাগের কোন এলাকা থেকে এটি সংগৃহিত বা বিশেষ কোন মসজিদের শিলালিপি এটি - এ বিষয়ে কোন তথ্য লালবাগ কেল্লা জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।

কমিটির উদ্যোগে শিলালিপিটি অনুবাদের পর (অনুবাদক আনিসুর রহমান স্বপন/কামাল হোসাইন) দেখা যায়, ১১৯৯ হিজরির শিলালিপি এটি। মসজিদ ও খানকার জন্য বাড়ি, বাগান, হাট ও খালসহ রবিনগর গ্রাম ওয়াকফ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে এতে। শিলালিপিতে উল্লেখিত রবিনগর গ্রামটি কোথায় এ বিষয়ে খোঁজ করে কোন তথ্য জানা যায়নি।

নাজির হোসেনের পুত্র ও আমলীগোলা বড় মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলতাফ হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোন তথ্য ও মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

বিগত শতাব্দির আশির দশকে আমলীগোলা বড় মসজিদের শিলালিপিটি মসজিদে স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী। মওলানা ফতেহ্‌পুরী জানান, বর্তমানে লালবাগ কেল্লা জাদুঘরে রক্ষিত শিলালিপিটি আমলীগোলা বড় মসজিদের নয়।

আলুরবাজার মসজিদের শিলালিপি

আলুরবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে ২০০৪ সালে মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের সময় থেকে। মসজিদটির বর্তমান অবস্থান আলুরবাজার মহল্লায় ৫৮ ওসমান গনি রোডে।

আলুরবাজার নামের উৎপত্তি নিয়ে দু'ধরনের মত আছে। একদল গবেষক মনে করেন, আল্লা ইয়ার খান এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম থেকে আলুরবাজার নাম হয়েছে।

আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন, বাজারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঈশা খাঁর বংশধর আলোয়ার খান। তার নাম থেকে আলুরবাজার হয়েছে।

'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ (পৃষ্ঠা ২৪০) আছে: *এ মহল্লায় আজ যে মসজিদটি আলুরবাজার ছোট মসজিদ বলা হয়, সেটা দুশো বছরের পূর্বে মুঘল সেনাপতি ফতে মুহাম্মদ খাঁ নির্মাণ করে গেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু শিলালিপি অনুসারে শেখ জান মুহম্মদ বিন জুনায়েদ নাম রয়েছে।*

আলুরবাজার ছোট মসজিদে আ. রহিম ৪০ বছর ধরে মোতাওয়াল্লি ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে হাজি মো. আব্দুল নাইম গত ২২ বছর মোতাওয়াল্লির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কমিটিকে জানান, আলুরবাজার মসজিদ ২০০৪ সালে ভেঙ্গে নুতন ভবন নির্মাণ করা হয়। পুরাতন কাঠামো ভাঙ্গার সময় শিলালিপি ভেঙ্গে যায়। এরপর টুকরা অংশগুলো ফেলে দেয়া হয়।

আলুরবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপির আলোকচিত্র বা পূর্ণাঙ্গ পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। বিগত শতাব্দির আশির দশকের মধ্যভাগে শিলালিপির পাঠ সংগ্রহ করেন মওলানা নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

রোকন চিশতীর মাজারের শিলালিপি

ধোলাই খালের তীরবর্তী মহল্লা রোকনপুর ঢাকার অন্যতম প্রাক মুঘল জনপদ। রোকনপুর নাম হয়েছে সাধক রোকন চিশতীর নাম অনুসারে। শিলালিপিটি বর্তমানে নিখোঁজ। তবে কবে থেকে নিখোঁজ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ।

ব্রিটিশ আমলে রোকনপুরকে পাঁচভাইঘাট লেন, কাজী আবদুর রউফ রোড, কুঞ্জবাবু লেন নামে নতুন নামকরণ করা হয়। তবে উল্লিখিত চার লেনের অঞ্চলসমূহ এখনও স্থানীয়ভাবে রোকনপুর নামে পরিচিত।

নাজির হোসেন 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৭৭) উল্লেখ করেন: *রোকনপুর নামটি সুলতানি তথা পাঠান আমলে রোকন উদ্দীন চিশতী নামে একজন পরহেজগার ব্যক্তি বসবাস করতেন তারই নামানুসারে হয়েছিল। তার মাজারও ঐ এলাকায় ছিলো। মাজারে কালো পাথরে যে ফলকটি ছিল, তাতে ফার্সী ভাষায় তার জন্ম, মৃত্যু ও পরিচয় উল্লেখ ছিলো। সে এলাকার ফার্সী ভাষার পণ্ডিত (মরহুম) মুন্সী সুরত আলী সেটিকে ঢাকা জাদুঘরে দেবেন বলে নিয়েছিলেন। তার ওখানে ইতিহাসবেত্তা হেকিম হাবিবুর রহমান ও এসএম তাইফুর সাহেবের যাতায়াত ছিল।*

রোকন চিশতীর মাজারের দৃশ্যমান অস্তিত্ব এখন আর নেই। বর্তমান ৫০ পাঁচভাই ঘাট লেনে মাজারের স্থলে গড়ে উঠেছে রোকনপুর গার্লস হাই স্কুল। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা নতুন সংঘ ক্লাব।

মুন্সী সুরত আলী ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার বংশধররা বর্তমানে পাঁচভাই ঘাট লেনে বসবাস করেন। নাজির হোসেনের গ্রন্থে উল্লেখিত রোকন চিশতীর মাজারের শিলালিপিটির খোঁজে মুন্সী সুরত আলীর বংশধরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, শিলালিপিটি তাদের কাছে নেই। এ প্রসঙ্গে মুন্সী সুরত আলীর নাতি হাশেম সূফী ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে জানান, রোকন চিশতীর মাজারের শিলালিপিটি মুন্সী সুরত আলীর কাছ থেকে গবেষক হেকিম হাবিবুর রহমান নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে শিলালিপিটি কোথায় আছে তাদের জানা নেই। হাশেম সূফী আরো বলেন, ঢাকার তথ্য সংগ্রহের জন্যে নাজির হোসেন তার কাছে আসতেন। এ সময় নাজির হোসেনকে তিনি শিলালিপি নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। কিন্তু নাজির হোসেন তার গ্রন্থে বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপন করেননি। তিনি আরো বলেন, মুন্সী সুরত আলী মুন্সীর পূর্ব পুরুষ ছিলেন রোকন চিশতী।

তাঁতীবাজারের দু'টি মসজিদ

তাঁতীবাজার এলাকায় ২৯ কোতোয়ালি রোডের শাহ মোহাম্মদ জামালের আস্তানা ও মসজিদে শিলালিপির কথা উল্লেখ আছে 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে। মসজিদটি সম্পর্কে বলা হয়: *তাঁতীবাজারের দক্ষিণে একটি প্রশস্ত চার দেয়ালের ভেতর শেখ সাহেব মাদ্রাসার সন্নিকটে রয়েছে একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আর অপর একটি গম্বুজের নিচে দুইজন ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তাছাড়া বাইরে অনেক পাকা কবর রয়েছে। দক্ষিণে কয়েকটি কক্ষ এবং উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত কিছু জায়গা রয়েছে। তার সাথে কিছু ঘর আস্তানার জন্যে ওয়াকফ্ করা আছে।*

গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়: *আস্তানাটি সংক্ষিপ্ত বেষ্টনির মধ্যে ছিল। পরে আশপাশের জমি ক্রয় করে আস্তানার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। মাজারের গায়ে কিছু লেখা*

নেই। মসজিদের গায়ের লেখা এতটা অস্পষ্ট যে কিছু পড়া যায় না।

মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন শাহ জামালের মাজারে শিলালিপি ছিল।

হাশেম সূফী জানান, তাঁতীবাজার বড় মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের আগ পর্যন্ত মসজিদ ও মাজারে শিলালিপি দেখা গেছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন মসজিদ ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের সময় তিনি মসজিদের তৎকালীন মোতাওয়াল্লি জব্বার কমিশনারকে শিলালিপিগুলো সংরক্ষণের অনুরোধ করেছিলেন।

এ ব্যাপারে মসজিদের ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শিলালিপি বিষয়ে কোন মন্তব্য করা বিরত থাকেন এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। মসজিদ পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ হাজি মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শিলালিপি থাকার কথা অস্বীকার করেন।

মীর গোলাম মোস্তফার মাজার

মীর গোলাম মোস্তফার মাজারটি সিদ্দিকবাজারে, ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে, বংশাল থানায়। মাজারের গায়ে খোদিত লিপি বা শিলালিপিটি গত শতাব্দীর শেষার্ধে কোন এক সময় নিখোঁজ হয়।
১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হাকিম হাবিবুর রহমানের 'আসুদগানে ঢাকা' বইতে প্রকাশিত শিলালিপিটির অনুবাদ থেকে জানা যায়, ১৩২৫ হিজরি বা ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গোলাম মোস্তফার মৃত্যু হয়।

বর্তমানে মাজারটির স্থানে 'মীর ভবন' নামে বহুতল মার্কেট ভবন নির্মিত হয়েছে। আর এ মার্কেটেরই ভেতরে নিচতলার একটি কক্ষে মাজারটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর ঠিক গজ বিশেক পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ঈসা খাঁর নাতি মনওয়ার খাঁর মসজিদ। তারই পীরের নামে এ মহল্লার নাম সিদ্দিকবাজার হয়েছে বলে বিভিন্ন বই-পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়।

তবে কবে কিভাবে শিলালিপিটি নিখোঁজ হয়েছে মার্কেট কমিটি তা জানাতে পারেনি। এমনকি মাজারটি মীর গোলাম মোস্তফার বলেও স্বীকার করেনি তারা। কখনও শাহ পরানের খালাতো ভাই, কখনও বা অন্য কোন নামে মাজারটি পরিচিত করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে মার্কেট কমিটি। তাদের এমন ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যে মাজারটিকে মীর গোলাম মোস্তফার সমাধি বলেই মনে হয়।

'আসুদগানে ঢাকা' বইতে বলা হয়েছে, মীর গোলাম মোস্তফার কবরের সৌধের গায়ে খোদাই করে কবিতা লিখে দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফিদা আলী খান। মোস্তফা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের নামকরা উকিল, লেখক, বাদ্যযন্ত্রপ্রিয় সুচতুর ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি পরিষ্কার কালো ডোরা পশমের পাজামা, লাল কোর্তা ও টুপি পরিধান করতেন। কোথাও গেলে তিনি কোর্তার ওপর জামদানি আচকান পরিধান করতেন। জীবনের এক পর্যায়ে ভাগলপুরের নজিব উল্লাহ সাহেবের হাতে বন্দি হন তিনি।

শাহ আব্দুর রহিম

ঢাকায় মোজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রবর্তক শাহ আবদুর রহীমের মাজারের শিলালিপি ও মাজার সংলগ্ন মসজিদের শিলালিপিসমূহ নিখোঁজ হয়েছে ২০১০ সালের পর। সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীবাজারে শাহ আবদুর রহীমের মাজার ও মসজিদ।

শাহ আবদুর রহীম কাশ্মীর থেকে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও পরে ঢাকায় এসে আস্তানা স্থাপন করেন। ঢাকার লোকজন তাকে মিয়া সাহেব বলে ডাকতেন। তার আস্তানা যে অঞ্চলে ছিল, নবাবী আমলে সেটি পরিচিত হয়ে ওঠে মিয়া সাহেবের ময়দান হিসেবে। কোম্পানি আমলে অঞ্চলটির নাম হয় লক্ষ্মীবাজার।

পূর্ববঙ্গে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বিস্তারে শাহ আবদুর রহীম বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১১৫৮ হিজরি ৯ রমজান তারিখে তিনি ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে, এক পাগল তরবারি দিয়ে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ১ মাস ৩ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাকে আস্তানায় সমাহিত করা হয়। তার মাজারে স্থাপন করা ছিল একটি শিলালিপি। 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে শিলালিপিটির পাঠ। মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী আশির দশকে শিলালিপি জরিপকালে শাহ আবদুর রহীমের মাজারের শিলালিপিটি মাজারের সামনে স্থাপন করা দেখেছেন এবং পাঠ সংগ্রহ করেছেন।

হাশেম সূফী জানান, মিয়া সাহেবের ময়দানে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ ছিল। মসজিদটি ছিল এক গম্বুজ

বিশিষ্ট এবং মসজিদের দেয়াল ছিল ৮ ফুট পুরু। শাহ আবদুর রহিম প্রাচীন মসজিদ চত্বরে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। মসজিদটিতে দুটি শিলালিপি ছিল। একটি নির্মাণের শিলালিপি এবং অপরটি সংস্কারের শিলালিপি। শাহ আবদুর রহীমের মাজারসহ পরবর্তী সাধকদের মাজারে আরো কিছু শিলালিপি ছিল। ১৫/২০ বছর আগেও শিলালিপিসমূহ মসজিদ ও মাজারে দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে মাজারের মোতাওয়াল্লি সাইয়েদ আহমেদুর রহীমের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হলে কমিটিকে তিনি জানান, মসজিদ নির্মাণের সময় শিলালিপি দু'টি ভেঙ্গে গিয়েছিল। শিলালিপি পুনর্নির্মাণ করার জন্য একজন প্রকৌশলীকে দেয়া হয়েছে। তবে মাজারের শিলালিপি থাকার কথা তিনি অস্বীকার করেন।

শাহ নূরীর মাজারের শিলালিপি

মগবাজারের শাহ নূরীর মাজারের শিলালিপি বর্তমানে নিখোঁজ। তবে কবে থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিশিষ্ট লেখক ও সূফী সাধক শাহ নূরী তার মুরশিদ বাঘু দেওয়ানের নির্দেশে ঢাকায় এসে শাহ শকরের মসজিদে আস্তানা স্থাপন করেন। ১২০০ হিজরি সনের ১২ রবিউল আওয়াল তারিখে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মৃত্যুর পর মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তার মাজারে যে শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছিল, তার পাঠ রহমান আলী তায়েশের 'তাওয়ারীখে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিলালিপিটির বিষয়ে শাহ নূরীর মাজারের মোতাওয়াল্লি আবু তালেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মাজারটি আগে নিচু ছিল। মাটি ফেলে উঁচু করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, শিলালিপিটি তিনি কখনও দেখেননি।

'তাওয়ারীখে ঢাকা'য় উল্লেখিত মাজারের ৪টি শলালিপি

রহমান আলী তায়েশের গ্রন্থে ঢাকার বিশিষ্ট ৪ জন ব্যক্তির মাজারের শিলালিপি পাঠ রয়েছে। ৪টি শিলালিপি হচ্ছে বিশিষ্ট জমিদার ও সমাজসেবক মীর্জা গোলাম পীর-এর মাজারের শিলালিপি (পৃষ্ঠা-১২০), বিশিষ্ট পণ্ডিত মুন্সী ইনায়েত আলী-এর মাজারের শিলালিপি (পৃষ্ঠা-১২১), বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চিকিৎসক মুন্সী মুতাসিম বিল্লাহ-এর মাজারের শিলালিপি (পৃষ্ঠা-১২৫) ও ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা আলীমউল্লাহ-এর মাজারের শিলালিপি (পৃষ্ঠা-১৪৩)। জরিপকালে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও উল্লেখিত মাজারের শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শিখ সঙ্গত

শিখ সঙ্গতের অবস্থান ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে, সূত্রাপুর থানায়। এ সঙ্গতের নাম থেকেই পরবর্তীতে এ মহল্লার নাম সঙ্গতটোলা হয়েছে। এখনও ছোট এক মহল্লা হিসেবে টিকে থাকা সঙ্গতটোলার অবস্থান বাংলাবাজার ও লক্ষ্মীবাজারের মাঝামাঝি।

বর্তমানে এর কোন শিলালিপি না পাওয়া গেলেও নাজির হোসেনের 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে একখণ্ড পাথরে পাঞ্জাবি ভাষায় কিছু তত্ত্বকথা উৎকীর্ণ করে সংরক্ষিত ছিলো।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' বইতে বলা হয়েছে, 'শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সঙ্গত ১৬৮৫ সালে ঢাকা আসেন। এ সঙ্গতের এক ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি থাকতেন। বর্তমান সঙ্গতটি বিশ শতকে নির্মিত দু'তলা ইমারতের দ্বিতীয় তলায়। এখানে তেগ বাহাদুরের তলোয়ার, ১৭৩২ সালের একটি গ্রন্থ সাহেব, তার কয়েকটি চিঠি, সিরাজদৌল্লার আমলের গ্রন্থ সাহেব সংরক্ষিত আছে।'

তবে এসবের খোঁজ এখন আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে গুরুদুয়ারা ও গুরুনানক স্টেট পরিচালনার কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় এ সঙ্গতটি পরিচালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত গুরুদুয়ারায় এ সঙ্গতের পরিচালনা কেন্দ্র রয়েছে।

গুরুদুয়ারার সেক্রেটারি নারায়ণ রবি দাস এ প্রসঙ্গে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে জানান, শিখ ভাষায় উৎকীর্ণ কোন শিলালিপির কথা তার জানা নেই। এমনকি তেগ বাহাদুরের তলোয়ার, তার কয়েকটি চিঠি, ১৭৩২ সালের গ্রন্থ সাহেব ও সিরাজদৌল্লার আমলের গ্রন্থ সাহেব সংরক্ষিত থাকার কথাও অস্বীকার করেন তিনি।

বর্তমানে সঙ্গতটি দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সনু সিংও এসব কিছু থাকার কথা অস্বীকার করেন।

নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থান

নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের কমপক্ষে ৩৫টি শিলালিপি গত ৪০ বছরে নিখোঁজ হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি

শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দির নব্বই দশকের পর। নিখোঁজ শিলালিপিগুলোর মধ্যে ২৫টির পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশ হয়নি। অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী নকী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে উল্লিখিত শিলালিপিগুলোর পাঠ সংগ্রহ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) করেছিলেন।

নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানে মুঘল, কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমলের শিলালিপি রয়েছে। মুঘল আমলে নারিন্দায় ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের অগাস্তানিয়ান সম্প্রদায়ের একটি মঠ ছিল। মঠটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। ধারণা করা হয়, কবরস্থানের পাশেই ছিল মঠটি।

নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের রয়েছে এক নিজস্ব ঐতিহ্য। সারা বিশ্বে সাধারণত ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট ও অর্থডক্স মতবাদে বিশ্বাসীদের পৃথক কবরস্থান থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কবর। অল সোল ডে উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সমাহিতদের উত্তরপুরুষরা এসে যোগ দেন নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের অনুষ্ঠানে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষ সমাহিত হয়েছেন নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানে। নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানে কতগুলো সমাধি ছিল, কতগুলো শিলালিপি ছিল সুনির্দিষ্ট জানা যায়নি। বিভিন্ন গির্জার খাতায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তিদের নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখা আছে। তবে মৃতের সমাধিতে শিলালিপি ছিল কিনা এ সর্ম্পকিত কোন তথ্য গির্জার খাতায় লেখা নেই। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের ব্যাপক সংখ্যক শিলালিপি নিখোঁজ হয়ে গেছে। তবে নিখোঁজের সংখ্যাও জানা যায়নি।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বেঙ্গল : পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' (জার্নাল অব মডার্ন ইন্ডিয়ান অ্যান্ড এশিয়ান হিস্টরি) জার্নালের ভলিয়ম : ১৫ সংখ্যায় ছাপা হওয়া শিলালিপি তালিকাটিকে কেস স্টাডি হিসেবে ধরলে এখান থেকে এপিটাফ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার মাত্রা হয়তো কিছুটা অনুমান করা যায়।

'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধের তালিকায় উল্লেখ করা ৩০টি শিলালিপির পাঠ উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে এখন মাত্র দশটির অস্তিত্ব আছে নারিন্দা কবরস্থানে। বাকি ২০টি শিলালিপি এখন নিখোঁজ। ওই তালিকার নিখোঁজ হওয়া শিলালিপিগুলো হলো- নিকোলাস (১৭৫৫), টমাস ফেইক (১৭৫০), মিসেস এলি.. (১৭৪২), মিসেস ডে কার্লিয়ার (১৮৩৬), মি. জেমস মিলস (১৭৭৩), মি. জেমস হান্টার (১৭৮৫), রবার্ট লিন্ডসে (১৭৭৮), ফ্রান্সিস অ্যানি মিডলটন (১৭৮৪), এলিজাবেথ কার্লটন (১৭৬৬), রবার্ট একমটি (১৭৯৭), চার্লস টেইলর (১৭৯৭), জর্জ মিডলটন (১৭৮৯), হেনরি হল্যান্ড (১৮০০), ক্রিস্টোফার রবার্টস (১৮০১), জন ডেভিড পিটারসন (১৮০৯), কর্নেল ডব্লিউএম বারটন (১৮১৭), মিসেস সি বারটন (১৮০৯), উইলিয়াম গর্ডন (১৮১৭), লে. কর্নেল ডব্লিউ এইচ কুপার (১৮২২) ও মিসেস আন্তনিয়া ফ্যালকোনার (১৮২১) এর সমাধির শিলালিপি।

'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধের উল্লিখিত শিলালিপিগুলোর মধ্যে ১০টি শিলালিপি বর্তমানে কবরস্থানের পূর্বদিকে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ সালে নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের শিলালিপি বিষয়ে জরিপ চালায়। ২০০৯ সালে শিলালিপিসমূহের তালিকা তৈরি করে। তখন 'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধের তালিকায় উল্লেখ করা শিলালিপিগুলো কবরস্থানে স্থাপন করা ছিল না।

২০১০ সালে জুলাই মাসে নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থান সরেজমিন অনুসন্ধানের সময় এক ঘটনায় বিস্মিত হয় ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির মাঠকর্মীরা। কবরস্থানে নতুন কিছু শিলালিপির অস্তিত্ব লক্ষ্য করে তারা। কবরস্থানের মধ্য-পূর্বদিকের দেয়াল থেকে খানিকটা বর্গাকৃতির জায়গা নিয়ে কবরস্থানের ভেতরে চলে আসা এক একটি ভবনের দেয়ালে এবং দেয়াল লাগোয়া সেপটিক ট্যাংকের ওপর কয়েকটি শিলালিপি প্রতিস্থাপন করা আছে, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এগুলো হয় মুঘল, নয়তো কোম্পানি আমলের গোড়ার দিককার। অপেক্ষাকৃত নবীন শিলালিপি এ গুচ্ছে একটিও নেই। পরবর্তীতে 'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করা যায়, সদ্য প্রতিস্থাপন করা শিলালিপিসমূহের মধ্যে ১০টির উল্লেখ 'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধে রয়েছে।

'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধের তালিকায় উল্লেখ করা ৩০টি শিলালিপির পাঠ অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী নকীর তালিকায় নেই। অধ্যাপক মুহাম্মদ

আলী নকী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের বিস্তারিত জরিপ করেন। তিনি তখন কবরস্থানের প্রতিটি সমাধিসৌধের ড্রয়িং করেন, লিখে রাখেন প্রতিটি শিলালিপির পাঠ। অধ্যাপক আলী নকীর তালিকা থেকে জানা যায়, তখন 'সাম ওল্ড গ্রেইভস অ্যাট ঢাকা' শীর্ষক ওই প্রবন্ধে উল্লিখিত শিলালিপিসমূহের একটিও কবরস্থানে স্থাপন করা অবস্থায় ছিল না।

ঢাকার খ্রিস্টান সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপিগুলো ছিল কবরস্থানের দক্ষিণ-পূর্বদিকে। বিগত শতাব্দির আশির দশকে নতুন করে কবর দেয়ার জন্য দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন কবরের সৌধগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। তখন শিলালিপিগুলো কবরস্থান অফিসে রাখা হয়েছিল। ২০১০ সালে সেই শিলালিপিগুলো আবার পূর্বদিকে পুনঃস্থাপন করা হয়। তবে অফিসে রক্ষিত শিলালিপির সংখ্যা আরো বেশি ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

বিগত শতাব্দির আশির দশক থেকে নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানে পুরানো সমাধিসৌধ ভেঙ্গে নতুন কবর দেয়ার জন্য জায়গা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। তবে পুরানো সমাধিসৌধ ভাঙ্গার পর শিলালিপি পুনঃস্থাপনে পরিকল্পনা ও যত্নের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। কবরস্থান চত্বরের মধ্য-পূর্বাঞ্চলে একটি সড়কে ইট-সিমেন্টের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে কয়েকটি শিলালিপি। কবরস্থানের মূল গেট দিয়ে প্রবেশ করলেই হাতের ডানদিকে পড়ে একটি কলতলা। কলতলায় পাকা কাঠামোর পরিবর্তে স্থাপন করা হয়েছে কয়েকটি ভাঙ্গা শিলালিপি। কলম্বো সাহিব চত্বরের উত্তর দিকে সড়ক ও কবর চত্বরের মধ্যে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে শিলালিপি।

তেজগাঁও গির্জার শিলালিপি

ভাষার দিক দিয়ে সবচেয়ে বৈচিত্রময় তেজগাঁও গির্জার শিলালিপিগুলো। এখানে রয়েছে ইংরেজি, লাতিন, পর্তুগিজ, আর্মেনিয় ভাষার শিলালিপি। ক্যাথলিকদের পাশাপাশি এখানে রয়েছে অর্থডক্সদের সমাধির শিলালিপি। শিলালিপির সংখ্যার দিকে দিয়ে আর্মেনিয়ান গির্জা ও নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের পরই তেজগাঁও গির্জার অবস্থান। নব্বই দশকের পর তেজগাঁও গির্জা থেকেও শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ঢাকায় খ্রিস্টান সমাজের প্রথম উপাসনালয় তেজগাঁও গির্জার বর্তমান দাপ্তরিক নাম জপমালা রাণীর গির্জা। অবস্থান ফার্মগেটের উত্তর দিকে।

গবেষক জেরোম ডি কস্তা'র মতে, তেজগাঁও গির্জাটি প্রথম নেস্তোরীয় খ্রিস্টানরা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মুঘল আমলে ক্যাথলিকদের অধীনে আসে গির্জাটি। তেজগাঁও গির্জা সম্পর্কে জেরোম ডি কস্তার লেখা 'বাংলাদেশে ক্যাথলিকমণ্ডলী' গ্রন্থে উল্লেখ (পৃষ্ঠা ৪২০) করা হয়: *তেজগাঁও গীর্জাভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি কবরফলক আছে, যার মধ্যে আর্মেনীয় ভাষায় লিখিত কবর-ফলকও পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীদের ক্যাথলিকমণ্ডলীভুক্ত না হয়ে বরং নেস্তোরীয় মণ্ডলীভুক্ত হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। আর পরবর্তীকালে নেস্তোরীয় খ্রিষ্টানদের সংখ্যাল্পতা বা অন্য কোন কারণেই হোক, তেজগাঁয়ের এই মূল গির্জাটি ক্যাথলিক বাণীপ্রচারকদের অধীনে আসে।*

১৯৮৮ সালে আগস্ট মাসে প্রকাশিত এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়: *তেজগাঁও গীর্জার ওপরে '১৬৭৭ খ্রী:' কথাটি লেখা আছে - এ তারিখটি বঙ্গের এ অঞ্চলে বহুসংখ্যক ইউরোপীয়দের উপস্থিতিকালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ সময় পর্তুগীজগণই হয়তো নেস্তোরীয় খ্রীষ্টানদের প্রথম গীর্জাটির সম্প্রসারণ ঘটান। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দটি তেজগাঁয়ে পর্তুগীজ অগাষ্টিনিয়ান বাণী যাজকদের বাণীপ্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার তারিখ নিশ্চিত।*

তেজগাঁও গির্জার শিলালিপিগুলো গির্জার মূল ভবনের উত্তর ও দক্ষিণ পাশের দেয়ালে পুনঃস্থাপন করা আছে। ২০০০ সালে তেজগাঁও গির্জায় ব্যাপক সংস্কার কাজ চালানো হয়। তখন গির্জার মূল ভবনের মেঝে এবং গির্জা সংলগ্ন চত্বরের বিভিন্ন সমাধিসৌধ থেকে খুলে এনে শিলালিপিসমূহ গীর্জার দেয়ালে প্রতিস্থাপন করা হয়।

তেজগাঁও গির্জায় শিলালিপি সংখ্যা ছিল আরো বেশি। সংশ্লিষ্টদের মতে, নব্বইয়ের দশকের পর বেশ কিছু শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে। তবে কতগুলো শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি তেজগাঁও গির্জার ইতিপূর্বে তৈরি করা শিলালিপির কোন তালিকা।

তেজগাঁও গির্জায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এবং ২০০১ সালে সহকারি পালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও। তিনি বলেন, 'গির্জার পূর্বপাশে বিশাল আকৃতির আর্মেনিয় ভাষার শিলালিপি ছিল। ১৯৮৭ সালে সেই শিলালিপিটির পাশে একটি তেজপাতা গাছ লাগিয়েছিলাম। সেই বিশাল আকৃতির শিলালিপিটি এখন আর দেখা যায় না। আশির

দশকে তেজগাঁও গির্জায় এমন কিছু শিলালিপি ছিল, যা এখন আর দেখা যায় না।'

তিনি আরো জানান, বেশ কিছু শিলালিপি ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। ভাঙ্গা শিলালিপিগুলোর কয়েকটি দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে। তবে ভাঙ্গা আরও কয়েকটি শিলালিপি দেয়ালে দেখা যাচ্ছে না।

ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও কমিটিকে আরো জানান, গির্জার শিলালিপিগুলো আগে দেয়ালে ছিল না। ছিল মেঝেতে। ছিল বিভিন্ন সমাধিসৌধের দেয়ালে। ২০০০ সালে তেজগাঁও গির্জায় ব্যাপক সংস্কার হয়। তখন কবর, মেঝেসহ বিভিন্ন স্থান থেকে শিলালিপিগুলো এনে গির্জার দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রিক ভাষার নিখোঁজ শিলালিপি

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল গ্রিকদের একটি কবরস্থান। কর্নেল ডেভিডসন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন ঢাকায় এসেছিলেন, তখনও কবরটির অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে কবরস্থানটির কোন অস্তিত্ব নেই। গ্রিক কবরস্থান বিলুপ্ত হওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখও জানা যায় না। তবে টিএসসি চত্বরে বর্তমানে একটি গ্রিক স্মৃতিসৌধ রয়েছে। স্মৃতিসৌধের ভেতরে ৯টি শিলালিপি রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি ইংরেজি ভাষার এবং ৫টি গ্রিক ভাষার।

ডেভিডসন কবরস্থানটি সম্পর্কে লিখেছেন: *রেসকোর্সের পাশে আছে গ্রীকদের একটি কবরস্থান। সমাধিগুলো অলংকৃত বা সুন্দর কোনটিই নয় বরং সবগুলি কবরই নোংরা ও অবস্থা খারাপ। এগুলোর দেখাশোনার জন্য দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও পুরো চত্বরটি গরু বাছুর আর ছাগল পূর্ণ।*

ইতিহাসবিদদের মতে, গ্রিক সম্প্রদায় ঢাকায় এসেছিলেন আঠার শতকে। উনিশ শতকের শেষভাগে প্রায় গ্রিক শূন্য হয়েছিল ঢাকা। ধারণা করা হয়, এরপর কবরস্থানটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গ্রিকদের একটি গির্জা ছিল ঢাকায়। কর্নেল ডেভিডসন তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন এই গির্জাটির কথা। ঢাকার মৌলভীবাজারে ছিল সেটির অবস্থান। গির্জাটির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। কবে বিলুপ্ত হয়েছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ পাওয়া যায় না। সেখানে বর্তমানে একটি দরবার শরীফ ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ঢাকার গ্রিক গির্জা এবং গির্জা সংলগ্ন কবরের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় না। ঢাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একজন সংগঠক এ প্রসঙ্গে বলেন, তিনি তার পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছেন, গ্রিক গির্জায় ঢাকার অন্যান্য প্রাচীন গির্জার মতো শিলালিপি ছিল। সেগুলোর অধিকাংশের ভাষাই ছিল গ্রিক।

আর্মেনিয়ান গির্জার শিলালিপি

ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি শিলালিপি রয়েছে আর্মেনিয়ান চার্চে। শুধু ঢাকা কেন, বাংলাদেশে কোন ধর্ম ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এতো বেশি প্রাচীন শিলালিপি একসাথে আছে কিনা সন্দেহ। তবে আর্মেনিয়ান চার্চের মোট শিলালিপির সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। কমিটির মাঠকর্মীদের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আর্মেনিয়ান চার্চে আর্মেনিয়ান, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষার আড়াই শতাধিক শিলালিপি রয়েছে।

বিভিন্ন শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণসহ কমিটির কর্মকাণ্ডে তেজগাঁও চার্চ, সদরঘাট ব্যাপিস্ট চার্চ, নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থান, ব্যাপিস্ট কবরস্থান কর্তৃপক্ষসহ ঢাকার খ্রিস্টান সমাজের কাছ থেকে কমিটি সর্বাত্মক সহায়তা পেয়েছে। ব্যতিক্রম আর্মেনিয়ান চার্চ।

২০০৯ সাল থেকে চেষ্টা করে এখনও আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়নি। ২০০৯ সাল থেকে কমিটির মাঠকর্মীরা আর্মেনিয়ান চার্চের শিলালিপিসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণের লক্ষ্যে চার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চার্চ কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করতে থাকে।

এ অবস্থায় ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির মাঠকর্মীরা শিলালিপির সংখ্যা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বাধার কারণে তাও সুষ্ঠুভাবে করা যায়নি। ২০১০ ও ২০১১ সালে আর্মেনিয়ান চার্চ চত্বরে একাধিকবার শিলালিপি গণনা শুরু করলে প্রতিবারই কর্তৃপক্ষ গণনা না করার জন্য 'উপরের নির্দেশ আছে' বলে গণনা কাজ থামিয়ে দিয়েছে।

২০১২ সালের মার্চ মাসে কমিটিকে জানানো হয়, আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। তবে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। ২০১২ সালের ২৭ মার্চ আলোকচিত্র গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়া হলে আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়। ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ কমিটির প্রতিনিধি আর্মেনিয়ান চার্চের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় তিনি আংশিক শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কমিটি

তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সবগুলো শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়ার অনুরোধ জানায়। তখন আর্মেনিয়ান চার্চে কতগুলো শিলালিপি আছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোন উত্তর দেননি। শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণ ও শিলালিপির সংখ্যা বিষয়ে পরে জানানো হবে বলে তিনি তখন আশ্বাস দেন। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হলে আংশিক আলোকচিত্র গ্রহণের কথা তারা বলেন এবং শিলালিপির সংখ্যার বিষয়ে নীরব থাকেন। এরপর বেশ কয়েকবার চার্চ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে আংশিক শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণের কথা তারা উল্লেখ করেন এবং শিলালিপির সংখ্যা জানাতে অস্বীকৃতি জানান। এ অবস্থায় ২০১৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ মস আরেফিন সিদ্দিক ঢাকার আর্মেনিয়ান চার্চের চেয়ারম্যান মিখাইল হোফসেফ মার্টিরোসেনে সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন।

বিভিন্ন সময়ে আর্মেনিয়ান গির্জার চেয়ারম্যান কমিটির কাছে বলেছে, আর্মেনিয়ান গির্জা একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অনুসন্ধানকালে আরো জানা গেছে, আর্মেনিয়ান গির্জায় ইতিপূর্বে কোন গবেষককে সকল শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। দেয়া হয়নি কতগুলো শিলালিপি আছে তার তালিকা বা তালিকা প্রণয়ণের সুযোগ। এমনকি ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এ ব্যাপারে অসহযোগিতা করে আসছে তারা।

আর্মেনিয়ান গির্জার শিলালিপি সম্পর্কে ডেইলি স্টার পত্রিকায় ২১শে জুন ২০১৩ সালে 'রেলিকস লেফট আনপ্রটেক্টেড' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, ২৩২ বছরের প্রাচীন আর্মেনিয়ান চার্চ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক সংরক্ষিত ভবনের তালিকাভুক্ত হলেও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত তা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেনি সংশ্লিষ্টদের অসহযোগিতার কারণে। আর্মেনিয়ান গির্জার শিলালিপির তালিকা না থাকা এবং তালিকা কাউকে করতে না দেয়ার বিষয়টিও ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে আলোচিত হয়।

প্রবীণ গবেষক ও অনুবাদক ফাদার সিলভানো গেরেল্লো এ প্রসঙ্গে বলেন, আর্মেনিয়ান গির্জাসহ ঢাকার সকল গির্জা ও কবরস্থানের শিলালিপি গ্রন্থিত করা উচিৎ ছিল। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার স্বার্থে আর্মেনিয়ান গির্জার শিলালিপিগুলোর আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিৎ। আলোকচিত্র গ্রহণে বাধা দেয়া কাম্য নয়।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি মনে করে, আর্মেনিয়ান গির্জার শিলালিপিগুলো আর্মেনিয়দের ঐতিহ্য, খ্রিস্টানদের ঐতিহ্য, বাংলাদেশের ঐতিহ্য, বিশ্ববাসীর ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য যথাযথভাবে গ্রন্থিত হওয়া দরকার। কমিটি এ লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি ও চারজন গবেষক

শিলালিপি জরিপ চলাকালে ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষকদের প্রায় সকলের সঙ্গে কমিটি যোগাযোগ করে বা করার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শ প্রতিবেদন প্রণয়ণের কাজে সহায়ক হয়েছে। তবে কমিটি সরেজমিন অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্য বেশি পেয়েছে চার জন গবেষকের কাছ থেকে। অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী নকী তাদের অন্যতম।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী নকী জন্মগ্রহণ করেন পুরানো ঢাকার নারিন্দায়, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। পড়াশোনা করেন সেন্ট গ্রেগরি স্কুল, নটরডেম কলেজ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে। কর্মজীবন শুরু করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি স্থাপত্য বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারম্যান। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জার্নালে তার গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী নকীর সঙ্গে কমিটির প্রথম যোগাযোগ হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচীন স্থাপত্য চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি আয়োজিত সরেজমিন কর্মসূচিতে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অংশ নেন।

২০১২ সালের প্রথম দিকে কমিটির তৈরি করা তালিকা অধ্যাপক আলী নকীর কাছে দেয়া হয়। ২০১২ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি তার খাতায় লেখা নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের শিলালিপির তালিকা কমিটির কাছে হস্তান্তর করেন। কমিটির তৈরি তালিকার সঙ্গে অধ্যাপক আলী নকীর তালিকা মিলানো হলে দেখা যায়, অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী নকীর তালিকায় উল্লিখিত ২৫টি শিলালিপি

বর্তমানে কবরস্থানে নেই। এ ২৫টি শিলালিপির কোন উল্লেখ অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী নকীর তালিকা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, নব্বইয়ের দশকে মাঝামাঝি সময়ে খ্রিস্টান কবরস্থানে এক সংস্কার কাজ পরিচালিত হয়। এ সময় দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলের সমাধিসৌধগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। নিখোঁজ হয়ে যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিলালিপিগুলো। শুধু খ্রিস্টান কবরস্থান ও গির্জার অনুল্লেখিত শিলালিপি নয়, নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে মসজিদ ও মাজারের অনুল্লেখিত শিলালিপি। ঢাকার অধিকাংশ শিলালিপির কথা গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

মসজিদ ও মাজারের আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার নিখোঁজ শিলালিপি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া গেছে শিলালিপি বিশেষজ্ঞ মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরীর কাছ থেকে। মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহপুরীর আগ্রহের মূল কেন্দ্র ভাষা। বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা তিনি চর্চা করেন। অনুবাদ করেছেন শেখ সাদীর 'কারীমা' কাব্যগ্রন্থ, বু আলী কলন্দরের কবিতা, রহমান আলী তায়েশের ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদি। রচনা করেছেন 'বিন্দুবিহীন বর্ণে মুহাম্মদ'সহ সাহিত্য, ইতিহাসহ আরো কিছু গ্রন্থ।

লালবাগের অন্যতম মুঘল স্থাপত্য বড় ভাট মসজিদের খতিব ও ইমাম হিসেবে মওলানা ফতেহ্পুরী প্রায় ৫৩ বছর দায়িত্ব পালন করছেন। বড় কাটরা মাদ্রাসায় ষাটের দশকে প্রথমে পড়াশোনা এবং পরে শিক্ষকতা শুরু করেন। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মুঘল স্থাপত্য বড় কাটরা থেকেই মূলত শিলালিপি বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয় তার। শুরু করেন শিলালিপির পাঠ সংগ্রহ। তিনি বিগত শতাব্দির আশির দশকে রাজধানী ঢাকাসহ বৃহত্তর ঢাকার ৫টি জেলায় সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন মসজিদ ও মাজারের শিলালিপির পাঠ ও ইতিহাস সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে এভাবে শিলালিপির পাঠ সংগ্রহের কোন উদ্যোগের কথা জানা যায় না। মওলানা ফতেহ্পুরীর কাছে পাঠ সংগৃহীত আছে, এমন অনেক মসজিদ ও মাজারের শিলালিপি নিখোঁজ হয়ে গেছে। মওলানা ফতেহ্পুরীর কাছ থেকে কমিটি পেয়েছে ৮টি নিখোঁজ শিলালিপির অপ্রকাশিত পাঠ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তার কাছে পাঠ নেই, কিন্তু তিনি স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন, এমন অনেক শিলালিপির কথা জানিয়েছেন।

২০০৮ সালে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু হয়। ২০১০ সালে কমিটির প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশের পর অক্টোবর মাস থেকে তিনি কমিটির কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন এবং ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সম্পাদনায় অন্যতম সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন।

পুরানো ঢাকার বিশেষত সূত্রাপুর ও কোতোয়ালী এলাকার নিখোঁজ শিলালিপির খোঁজ পাওয়া গেছে ঢাকার ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক হাশেম সূফীর কাছ থেকে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পুরানো ঢাকার দোলাইখাল সংলগ্ন মহল্লা পাঁচভাই ঘাট লেনে। ষাটের দশকে কিশোর অবস্থায় ছাত্র-গণআন্দোলনে যুক্ত হন। ২ নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। লেখালেখি শুরু করেন ছাত্রজীবনে। ইতিহাস তার আগ্রহের বিষয়। আগ্রহের কারণে তরুণ বয়স থেকেই ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা ও মহল্লার স্থাপত্য সম্পর্কে ইতিহাস জানার কাজ করে আসছেন হাশেম সূফী। বিভিন্ন জার্নাল ও পত্রিকায় তার ঢাকা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। হাকিম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

২০১০ সালে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ হয় হাশেম সূফীর। ২০১৩ সালে মার্চ ও এপ্রিল মাসে তিনি ঢাকার নিখোঁজ শিলালিপি বিষয়ে কমিটিকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। নিশ্চিত করেন বেশকিছু শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা। গত ৫ বছর ধরে সূত্রাপুর ও কোতোয়ালী এলাকার যারা শিলালিপির অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে আসছিলেন, হাশেম সূফীর বক্তব্য জানানোর পর তাদের অধিকাংশই স্বীকার করেন, শিলালিপি ছিল। নিখোঁজ হয়েছে। এমনকি গত চার বছর ধরে অস্বীকার করে আসছিলো এমন একটি মসজিদ কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে শিলালিপি এনে কমিটিকে আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

কমিটি নিখোঁজ শিলালিপির সন্ধান পেয়েছে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার কাছ থেকে। বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পথিকৃৎ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বিগত শতাব্দির ষাট, সত্তর ও আশির দশকে ঢাকার বিভিন্ন প্রত্নস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি স্থাপনায় স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন, এমন বেশকিছু শিলালিপি এখন নিখোঁজ।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার লেখা 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থটি বাংলাদেশের স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে কোষগ্রন্থ বলে বিবেচিত। এ গ্রন্থে তিনি সরেজমিন

অনুসন্ধানকালে দেখা বিভিন্ন শিলালিপির কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গ অঞ্চলকে নিয়ে ফারসি ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ বাংলায় সর্বাধিক অনুবাদ করেছেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন এবং লিখে চলছেন।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সঙ্গে কমিটির যোগাযোগ হয় ২০০৯ সালে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ঢাকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন আরবি, ফারসি ও উর্দু শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সম্পাদনার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কমিটির সদস্যদের নিয়ে পুরানো ঢাকায় প্রাচীন স্থাপত্য পরিদর্শন করেন।

নিখোঁজ শিলালিপি বিষয়ে কথা কথা হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে। শিলালিপিবিহীন প্রাচীন মসজিদসমূহের পরিচালনা কমিটির বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ, মোতাওয়াল্লি, সাবেক মোতাওয়াল্লি, ইমাম, ক্যাশিয়ার, মুয়াজ্জিনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। কথা বলা হয়েছে মসজিদের মুসল্লি ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে। জরীপচলকালে বিভিন্ন মসজিদ ও মাজার পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ কমিটির সদস্যদের সহায়তা করেছেন। ব্যতিক্রম নিখোঁজ শিলালিপির প্রতিষ্ঠানসমূহ। জরিপের শুরু থেকেই তারা কমিটি সদস্যদের সঙ্গে অপ্রীতিকর আচরণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বলেছে পরস্পর বিরোধী কথা। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে শিলালিপির অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন। ২০১০ ও ২০০১ সালে শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা স্বীকার করা শুরু করে। নিখোঁজ শিলালিপি খোঁজার সময় বেশ কিছু অপ্রকাশিত শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়।

সাত রওজা মসজিদে যোগাযোগ করা হলে প্রথম তিন বছর বলা হয়, মসজিদটিতে কখনও শিলালিপি ছিল না। সাত রওজা মসজিদে শিলালিপি বিগত শতাব্দির আশির দশকে মসজিদে স্থাপন করা অবস্থায় ছিল- এ তথ্য মওলানা ফতেহ্‌পুরীর কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে ২০১১ সালে মসজিদে আবার যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, আছে কিনা খুঁজে দেখা হবে। কিছুদিন পর শিলালিপি আছে বলে জানানো হয়। এরপর কমিটির পক্ষে শিলালিপিটির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং পাঠোদ্ধার ও অনুবাদের পর দেখা যায়, শিলালিপিটি মসজিদের নয়, বব্বু বেগমের মাজারের শিলালিপি।

শিলালিপি জরিপকালে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছেন। তবে প্রতিবেদনে কমিটির সর্বশেষ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ সাহেব বাজার দোতলা মসজিদ

শেখ সাহেব বাজার দোতলা মসজিদে শিলালিপি ছিল দু'টি। একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার শিলালিপি এবং অপরটি সংস্কারের শিলালিপি। আশির দশক পর্যন্ত শিলালিপি দু'টি মসজিদের গায়ে স্থাপন করা ছিল। নব্বই দশকে মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। প্রাচীন কাঠামোর পর থেকে মসজিদের শিলালিপি দু'টি নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপি দু'টির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

লালবাগ থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শেখ সাহেব বাজার মহল্লায় ১৫৫ লালবাগ রোডে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদটি বর্তমানে লালবাগ রোড দোতলা মসজিদটির নামেও পরিচিতি রয়েছে।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, কোন প্রখ্যাত শেখ এখানে বাস করতেন এবং তিনি একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করায় এলাকাটি শেখ সাহেব বাজার নামে পরিচিতি লাভ করে। পৌরসভার নথিতেও মহল্লার নামটি বিদ্যমান। এ মসজিদের পাশে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ফাজেল আফগানের কবর ছিল। বর্তমানে কবরটি ভেঙে সেখানে মসজিদ ভবন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কবরের জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছে ওজুখানা।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী আশির দশকে মসজিদটিতে দু'টি শিলালিপি স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন। তিনি জানান, শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল, ১১২১ হিজরিতে মসজিদটি ফাজেল আফগানের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হয়েছে। অপর শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল, ১২৪৭ হিজরিতে হোসাইন বখশের পুত্র মুরাদ বখশ মসজিদটির সংস্কার করেন।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি গঠনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করার পর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ শিলালিপি দু'টির আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য কমিটির আলোকচিত্রীকে আসতে বলেন। কমিটির পক্ষে ফটো সাংবাদিক সৈয়দ জাকির হোসেন মসজিদে গেলে শিলালিপিটি পাওয়া যাচ্ছে না বলে তখন জানিয়ে দেন তারা। মসজিদ কর্তৃপক্ষ তখন আরও জানিয়েছিলেন, তারা শিলালিপি আরও খোঁজে দেখবেন এবং পাওয়া গেলে আলোকচিত্র

গ্রহণের জন্য জানাবেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হলেও শিলালিপিগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

নবাবগঞ্জ বাজার মসজিদের শিলালিপি

নবাবগঞ্জ বাজার মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ১৯৯৭ সালে ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ রয়েছে প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার পর থেকে। লালবাগ থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৮০ নবাবগঞ্জ রোডের এই মসজিদটির শিলালিপির কোন পাঠ অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন মসজিদ ভবনটি ছিল এক-কাঠামো বিশিষ্ট। নবাবগঞ্জ বাজার মসজিদ পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ হাজি মোহাম্মদ আলমগীর জানান, প্রাচীন মসজিদ ভবনটি ছিল খুবই ছোট এবং ইটের সঙ্গে চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত। মসজিদের প্রাচীন ভবনের প্রবেশপথের উপরে শিলালিপিটি স্থাপন করা ছিল। প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার সময় রাজমিস্ত্রীর সহযোগীরা শিলালিপিটি ভেঙ্গে ফেলে। ভাঙ্গা টুকরাগুলো এরপর ফেলে দেয়া হয়।

তেলিপাড়া মসজিদের শিলালিপি

তেলিপাড়া মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয় ১৯৮৩ সালের পরে। লালবাগ থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৬৬ নবাবগঞ্জ রোডের এই মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ১৯৮৩ ভেঙ্গে নতুন মসজিদ ভবন নির্মাণের পর শিলালিপিটি নিখোঁজ হয়ে যায়। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

তেলিপাড়া সম্পর্কে 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৪০৭) উল্লেখ করা হয়: *নবাবগঞ্জ রোডের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের একটি ছোট অংশ তেলিপাড়া নামে পরিচিতি লাভ করেছিলো। এখানে ৩/৪ যুগ পূর্বেও কুলু সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। তারা ঘানি ঘুরিয়ে সরিষার তেল উৎপাদন করতো। এখনও প্রৌঢ় ব্যক্তিরা ঐ অঞ্চলটিকে তেলিপাড়া নামেই আখ্যায়িত করে।'*

তেলিপাড়া মসজিদের ইমাম হাফেজ মওলানা ফরীদ আহমদ জানান, নতুন ভবন তৈরির পর মসজিদ থেকে শিলালিপিটি চুরি হয়ে যায়। মসজিদে ৩৭ বছর ধরে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করছেন নুরুদ্দীন আহমদ। তিনি ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে জানান, তেলিপাড়া মসজিদের প্রাচীন ভবনের প্রবেশপথের উপরে শিলালিপিটি স্থাপন করা ছিল। শিলালিপিটির রং ছিল ধূসর এবং ভাষা ছিল ফার্সি।

নুরুদ্দীন আহমদ আরো জানান, নতুন মসজিদ ভবন নির্মাণের পর নতুন ভবনের নিচতলায় শিলালিপিটি রাখা হয়। এটি নতুন ভবনে প্রতিস্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু একদিন শিলালিপিটি চুরি হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শিলালিপিটি আর পাওয়া যায়নি।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী জানান, মসজিদটির নির্মাতা নওয়াবগঞ্জের বাসিন্দা মুক্তি বিবি। ১২৮১ হিজরি সালে (১২৭১ বঙ্গাব্দ) সালে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

মালিবাগ ছোট ও বড় মসজিদের শিলালিপি

লালবাগ থানায় সিটি (দক্ষিণ) করপোরেশনের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে নবাবগঞ্জ সংলগ্ন মহল্লা আবদুল আজিজ লেনে দু'টি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। মসজিদ দু'টি মালিবাগ ছোট মসজিদ ও মালিবাগ বড় মসজিদ নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। তবে আবদুল আজিজ লেন ছোট ও বড় মসজিদ নামেও অভিহিত করা হয়। দু'টি মসজিদেই শিলালিপি ছিল। এখন নিখোঁজ। এর মধ্যে মালিবাগ ছোট মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ নব্বই দশকের পর থেকে। উল্লিখিত মসজিদ দুটির শিলালিপিগুলোর কোন পাঠ পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে আবদুল আজিজ লেন বলে উল্লিখিত অঞ্চলটির প্রাচীন নাম মালিবাগ। মহল্লাটির আশপাশে ছিল মুঘল অভিজাত ব্যক্তিদের কয়েকটি বাগান। জনশ্রুতি আছে, মুঘল আমলে অঞ্চলটিতে মালিরা বসবাস করতেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন কমিশনার আবদুল আজিজ মাস্টারের নামানুসারে অঞ্চলটির নামকরণ করা হয় আবদুল আজিজ লেন।

মালিবাগ ছোট ও বড় মসজিদের শিলালিপি মসজিদের দেয়ালে স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী। মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী জানান, মালিবাগ ছোট মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর মূল প্রবেশপথের ওপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। পাথরের রং ছিল কালো এবং এতে নির্মাতার নাম ও নির্মাণ সন উল্লেখ ছিল। আরবি অক্ষরে শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল মাহমুদ জামাল বিন নূর জামাল ও ১২৫২ হিজরি সন।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। এরপর থেকেই শিলালিপিটি নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজ শিলালিপি বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য বিভিন্ন সময়ে মসজিদ পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা, ইমাম, মুয়াজ্জিনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তার এ বিষয়ে কোন বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

মালিবাগের দু'টি মসজিদের মধ্যে ছোট মসজিদটি প্রাচীন। এ সম্পর্কে নাজির হোসেন তার 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: *আলাবকস মহাজন নামে একজন ব্যবসায়ী জেদের বশবর্তী হয়ে আরেকটি মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিল।*

মালিবাগ মহল্লায় পরবর্তীকালে নির্মিত মসজিদটি বড় মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটির বর্তমান হোল্ডিং নম্বর ২৮/৩, আব্দুল আজিজ লেন। মালিবাগ বড় মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল এক-গম্বুজ বিশিষ্ট। প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। পাথরের রং ছিলো কালো।

মালিবাগ বড় মসজিদ পরিচালনা কমিটির নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করে শিলালিপি বিষয়ে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পিলখানা পোস্ট অফিস মসজিদ

পিলখানা পোস্ট অফিস মসজিদের অবস্থান লালবাগ থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৬ ললিত মোহন দাস লেনে। মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। ১৩৮৩ বাংলা সালে প্রথমবার এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার মসজিদটির সংস্কার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরও মসজিদের দেয়ালে শিলালিপিটি দেখা গেছে। শিলালিপিটি বর্তমানে নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ। অঞ্চলটি সম্পর্কে 'কিংবদন্তি ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়: *ললিত মোহন দাস লেনে ডা. ললিত মোহন দাস নামে একজন প্রভাবশালী লোক ছিলেন। এক সময় তিনি ঢাকা পৌরসভার কমিশনার পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবাবগঞ্জ এলাকার একটি অংশ তাঁরই নামানুসারে ললিত মোহন দাস লেন নামকরণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এই এলাকাটি স্থানীয়ভাবে বলদাটুলি ও সরকারী মানচিত্রেও বলিয়াটুলি নামে পরিচিত ছিলো। এই এলাকায় মালবাহী বলদ থাকতো ও তাদের মালিকরা বসবাস করতো বলেই হয়তো এর নাম বলদটুলি হয়েছিলো। এই নাম বহুদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিলো।*

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী জানান, পাকিস্তান আমলে শিলালিপিটি মসজিদে দেখা গেছে। পাথরের রং ছিল কালো। শিলালিপিটির ভাষা ছিল ফারসি। মসজিদের প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। মুক্তিযুদ্ধের পর আর শিলালিপিটি দেখা যায় না।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন বাপ্পী জানান, ১৯৯৭ সালে মসজিদটির দ্বিতীয় দফায় সংস্কার ও ভবন বর্ধিত করা হয়। সংস্কারের সময় কোন শিলালিপি ছিল না।

তিনি আরো জানান, ১৯৯৭ সালে তিনি মসজিদ কমিটির দায়িত্বে এসেছেন। শিলালিপির অস্তিত্বের কথা তিনি শোনেননি।

ছোট কাটরা ছোট মসজিদের শিলালিপি

ছোট কাটরা ছোট মসজিদের শিলালিপিটি নিখোঁজ হয় নব্বই দশকের শুরুতে। শিলালিপির পাঠ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ছোট কাটরার উত্তরদিকে ১১৩৩ হিজরি/১৭২০-২১ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়েছিল মসজিদটি। চকবাজার থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের ৩২/৩৩ হেকিম হাবিবুর রহমান রোডে এক-গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটির আদি কাঠামোর অস্তিত্ব বিগত শতাব্দির আশির দশক পর্যন্ত ছিল। তখন শিলালিপিটি স্থাপন করা ছিল মসজিদের দেয়ালে।

১৯৯৮ সালে মসজিদের আদি কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মসজিদের আদি কাঠামো ভাঙ্গার সময় শিলালিপিটি খুলে মসজিদ পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। মসজিদ কর্তৃপক্ষ তখন শিলালিপিটির পাঠোদ্ধারের জন্য লালবাগে মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঠোদ্ধার করা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) শেষ হলে তারা আবার নিয়ে গিয়েছিলেন শিলালিপিটি। কিন্তু সেটি নতুন মসজিদ ভবন নির্মিত হওয়ার পর মসজিদের দেয়ালে আর পুনঃস্থাপন করা হয়নি।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির মাঠকর্মীরা গত তিন বছর বিভিন্ন সময়ে মসজিদ পরিচালনা কমিটির

নেতৃবৃন্দ, ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুসুল্লিদের সাথে কথা বলে শিলালিপিটি এখন কোথায় আছে তা জানতে পারেননি।

ছোট কাটরা ছোট মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজি খোরশেদুল ইসলাম জানান, মসজিদটি ভাঙ্গার সময় তিনি ও বর্তমান সভাপতি দায়িত্বে ছিলেন না। তখন যারা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তারা ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দ কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের সময় শিলালিপিটি পায়নি। তিনি আরো জানান, শিলালিপিটি এখন কোথায় আছে তা তারা জানেন না। তবে তারা সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। খুঁজে পেলে আমাদের জানানো হবে।

লালবাগ শাহী মসজিদের শিলালিপি

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ গেটের দক্ষিণে লালবাগ শাহী মসজিদের অবস্থান। ফররুখ শিয়ার ঢাকার সুবেদারের দায়িত্ব পালনকালে এ মসজিদটি নির্মিত হওয়ার কেউ কেউ মসজিদটিকে ফররুখ শিয়ারের মসজিদও বলে থাকেন। লালবাগ শাহী মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে নিখোঁজ। ইতিপূর্বে শিলালিপির পাঠ কোথাও প্রকাশ হয়নি।

নবাবী আমল থেকেই লালবাগ শাহী মসজিদ রাজধানীর ঢাকার অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে মসজিদটি আদি কাঠামোতে নেই। প্রথম নির্মাণের পর গত কয়েক দশকে কয়েকবার মসজিদটি সংস্কার করা হয়েছে। ১৮৭০ সালে খাজা আব্দুল গণির উদ্যোগে প্রথমবার সংস্কার করা হয়। আশির দশকে মসজিদটির আদি কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী বিগত শতাব্দির আশির দশকে শিলালিপিটির পাঠ সংগ্রহ করেছিলেন। শিলালিপি থেকে থেকে জানা যায়, শাহজাদা ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে ১১২৯ হিজরি বা ১৭১৬-১৭ সালে জনৈক আহমদ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

মওলানা ফতেহ্পুরী জানান, প্রত্নতত্ত্ব অধিপ্তরের মোহাম্মদপুরের অফিস থেকে লালবাগ মসজিদের শিলালিপিটির পাঠ সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, ঢাকার কোন শিলালিপি তাদের অফিসে নেই।

খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদের শিলালিপি

খাজে দেওয়ান লেন মহল্লায় দুটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে: খাজে দেওয়ান লেন শাহী মসজিদ ও খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদ। এর মধ্যে খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ও শিলালিপি বর্তমান। অন্যদিকে ১৯৮৬ সালে খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে বহুতল মসজিদ ভবন তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার পর থেকেই মসজিদের শিলালিপিটি নিখোঁজ। শিলালিপিটির পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশ হয়নি।

স্থানীয়ভাবে মসজিদটি খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদ হিসেবে পরিচিত হলেও নতুন মসজিদ ভবন নির্মাণের পর নাম দেয়া হয়েছে বায়তুল নুর জামে মসজিদ। মসজিদটির অবস্থান চকবাজার থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে। মসজিদটির হোল্ডিং নাম্বার ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ । নতুন মসজিদ ভবনের নিচতলায় মার্কেট এবং উপরের তলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জরিপ চলাকালে প্রথমে শিলালিপি থাকার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীকালে মসজিদ পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তারা জানান, মসজিদের আদি কাঠামো ভাঙ্গার সময় শিলালিপিটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর শিলালিপি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী বিগত শতাব্দির আশির দশকে মসজিদ-মাজারের শিলালিপি বিষয়ে জরিপ কাজ পরিচালনার সময় খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদের শিলালিপির পাঠ খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন (পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য)। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, জান বিবি ১১৪০ হিজরিতে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজি নুর হোসেনের সাথে এ বিষয়ে বার বার যোগাযোগ করা হয়েছে। হাজি নুর হোসেন জানান, ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করার পর তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শিলালিপিটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রহমতগঞ্জ মধ্য মসজিদের শিলালিপি

রহমতগঞ্জ মধ্য মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে নব্বইয়ের দশকে। ১৯৯০ সালে মসজিদের প্রাচীন

কাঠামোটি ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে নতুন ভবন নির্মাণের পর। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ। চকবাজার থানায় সিটি (দক্ষিণ) করপোরেশনের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৪১ রহমতগঞ্জ রোডের এই মসজিদটির প্রাচীন কাঠামোতে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি।

রহমতগঞ্জ ঢাকার অন্যতম প্রাচীন মহল্লা। কিংবদন্তি অনুযায়ী, শায়েস্তা খানের আমলে বখশী পদে চাকুরি করতেন নওয়াব রহমত উল্লাহ ওরফে নওয়াব রহমত খাঁ। তিনি বুড়িগঙ্গার তীরে একটি বাজার বসিয়েছিলেন। বাজারটির নাম হয়ে যায় রহমতগঞ্জ।

রহমতগঞ্জে তিনটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে রহমতগঞ্জ ক্বারী সাহেবের মসজিদের শিলালিপি পুনঃস্থাপন করা আছে। রহমতগঞ্জ ছাতা মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান গত ৩৬ বছর ধরে রহমতগঞ্জ মধ্য মসজিদের খতিব ও ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জানান, শিলালিপিটির রং ছিল কালো। ভাষা ছিল ফারসি। এতে লেখা ছিল, ১৮৩৩ সালে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে।

মওলানা মনিরুজ্জামান আরো জানান, মসজিদের নতুন ভবন নির্মাণের পর প্রায় ৪ বছর মসজিদের তিনতলায় শিলালিপিটি রক্ষিত ছিল। মসজিদের সাইনবোর্ড লেখার আগে নির্মাণ সাল দেখতে শিলালিপিটি মসজিদ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে সেটি আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বেগমবাজার ছোট মসজিদ

কারতলব খান মসজিদ বা বেগমবাজার বড় মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেগমবাজার ছোট মসজিদের অবস্থান। বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ বেগমবাজার রোডের এক গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট মসজিদটির শিলালিপি বর্তমানে নিখোঁজ।

মসজিদের শিলালিপিটির পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তবে প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার আগে বিগত শতাব্দির আশির দশকে মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী বেগমবাজার ছোট মসজিদের পাঠ সংগ্রহ করেছিলেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। শিলালিপিটি তখন মসজিদের পূর্বদিকের প্রবেশপথের ওপরে স্থাপন করা ছিল। শিলালিপিটির ভাষা ফারসি। পাথরের রং ছিল কালো।

শিলালিপি অনুসারে, ১৭২০-২১ সালে (১১৩৩ হিজরি) মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদটির নির্মাতা আমানুল্লাহ। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ দীন মোহাম্মদ জানান, পুরানো মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। মসজিদের প্রবেশ পথে লোহার গেট ও জুঁই ফুলের গাছ ছিল। মুসল্লিদের জন্য চৌবাচ্চাসহ অযুখানা ছিল।

১৯৬৫ সালে মসজিদটি প্রথমবারের মতো সংস্কার করা হয়। তখন প্রাচীন কাঠামোর পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০৯ সালে পুরানো মসজিদটি ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ৫ তলা ভবনের ভিত্তিস্থাপন এবং তিন তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

নিখোঁজ শিলালিপি সম্পর্কে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ দীন মোহাম্মদ বলেন, দু' বছর যাবত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এ সময় তিনি শিলালিপিটি দেখেননি। এর আগে হয়তো ছিল।

পাক পাঞ্জাতনের দরগার শিলালিপি

পাক পাঞ্জাতনের দরগার পাঁচকুড়ি শাহ-এর ওয়াকফ্-এর শিলালিপিটি নিখোঁজ হয়েছে নব্বইয়ের দশকের পর। শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল, ১২৫১ হিজরি সনে (১৮৩৫-৩৬ খ্রি:) পাক পাঞ্জাতনের দরগাহের সাথে একটি প্রকোষ্ঠ পাঁচকড়ি শাহ ওয়াকফ্ করেছেন। পাক পাঞ্জাতনের দরগার অবস্থান বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে জেলখানার পূর্বদিকে বেগমবাজার এলাকায়। পাক পাঞ্জাতনের দরগার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। সেখানে বর্তমানে একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ হচ্ছে।

'পাঞ্জাতনের দরগাহ' সম্পর্কে 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮৪) উল্লেখ আছেঃ *চক সার্কুলার রোড ও জেলখানা রোডের পূর্বদিকে একটি ছাউনির মধ্যে শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত হয়ে নিজেদের চিন্তাধারার আদান-প্রদান ও মতবিনিময় করতে দেখেছি আমি আমার*

ছেলেবেলায়। ছাউনির পূর্বদিকে ইতোপূর্বে একটি কবরের নিদর্শন ছিল।

পাঞ্জাতনের দরগার শিলালিপিটির পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশ হয়নি। বিগত শতাব্দির আশির দশকে মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দিন ফতেহ্পুরী শিলালিপিটির পাঠ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) লিখে রেখেছিলেন। তিনি জানান, পাঞ্জাতনের দরগা থেকে শিলালিপিটি বেগমবাজার ছোট মসজিদের ইমাম আবদুল আউয়াল-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি পাঠটি নিয়েছিলেন।

কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে এলাকার মুরুব্বি, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও মুসুল্লিদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিলালিপিটির বর্তমান অবস্থান জানা যায়নি।

বেগমবাজার ছোট মসজিদ পরিচালনা কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আলহাজ দীন মোহাম্মদ এ প্রসঙ্গে বলেন, দু'বছর যাবত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এ সময় তিনি শিলালিপিটি দেখেননি। এর আগে হয়তো ছিল।

পুরানো মুঘলটুলী মসজিদের শিলালিপি

পুরানো মুঘলটুলী মসজিদের শিলালিপি নিয়ে পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া গেছে। কথিত আছে, ইসলাম খানের সময়ে ধোলাই নদীর তীরে এবং বংশালের দিকে একটি নৌঘাঁটি স্থাপন করা হয়। এর পাশে গড়ে উঠেছিল মুঘল নৌ সেনাদের বসতি। এলাকাটি পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে পুরানো মুঘলটুলী বলে। পুরানো মুঘলটুলী মহল্লার এই প্রাচীন মসজিদটির বর্তমান অবস্থান বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৪ বংশাল রোডে। মসজিদটির বর্তমান দাপ্তরিক নাম মালিটোলা আহলে হাদিস জামে মসজিদ।

পুরানো মুঘলটুলীর প্রবীণ বাসিন্দা ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইব্রাহিম জানান, প্রাচীন মসজিদটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। ১৯৬৫ সালে প্রাচীন মসজিদটি ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। এরপর ১৯৯১ সালে আবার মসজিদ ভবন ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মসজিদটিতে বাংলায় লেখা একটি শিলালিপি ছিল। এতে ১৩৫৩ হিজরি সংস্কারের সন বলে উল্লেখ ছিল। শিলালিপিটি হারিয়ে গেছে।

মসজিদের মোতাওয়াল্লি ডা. আবু জায়েদ জানান, বংশালে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পুরানো মুঘলটুলী মসজিদ। মসজিদের শিলালিপি থাকা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার জানা মতে, মসজিদটিতে কোন শিলালিপি ছিল না। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ষাটের দশকের শেষভাগে তিনি মসজিদে যুক্ত হন। ফলে এর আগের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না।

সাত রওজা মসজিদ

সাত রওজা মসজিদটির শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে নব্বইয়ের দশকে। মসজিদের শিলালিপির পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬ আবুল হাসনাত রোডে মসজিদটির অবস্থান।

বিগত শতাব্দির আশির দশকে মসজিদ-মাজারের শিলালিপির পাঠ সংগ্রহকালে মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী সাত রওজা মসজিদের শিলালিপির পাঠ লিপিবদ্ধ করেছিলেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

শিলালিপি অনুসারে জনৈক হামিদা (প্রশংসিত হামিদা) এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এর নির্মাণ তারিখ ১১৯৮ হিজরি বা ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ। একসময় মসজিদটির মোতাওয়াল্লির দায়িত্ব পালন করেছেন খাজা নেহাল। এরপর থেকে মসজিদটিকে খাজা নেহাল মসজিদ হিসেবে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে সাত রওজা মসজিদ নামেই এটি বেশি পরিচিত।

আগা মসীহ লেন মসজিদ

আগা মসীহ লেন মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শেষভাগে। বংশাল থানায় ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৭০ আগাসীহ লেনে মসজিদটির অবস্থান।

আগা মসীহ লেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজি মোহাম্মদ ওসমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মসজিদটি দুই শতাধিক বছরের পুরোনো। প্রাচীন কাঠামোটি ছিল এক-গম্বুজ বিশিষ্ট।

মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে মোহাম্মদ ওসমান বলেন, তিনি বিভিন্ন জনের কাছে শিলালিপির খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারছে না।

খাকী শাহ-এর মসজিদের শিলালিপি

নাজিরাবাজার এলাকার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ খাকী শাহের মসজিদটি ১৮২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩০০ হিজরি) সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। ২০০০ সালে মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার পর থেকে মসজিদের শিলালিপিটি নিখোঁজ। এটির পাঠ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। মসজিদটির অবস্থান বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৭৭ কাজী আলাউদ্দিন রোডে।

বিগত শতাব্দির আশির দশকের মধ্যভাগে মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে যখন জরিপ চালাচ্ছিলেন, তখন খাকী শাহের মসজিদের শিলালিপিটি মসজিদের দেয়ালে স্থাপন করা ছিল। ১৯৮৬ সালের ১৫ আগস্ট মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী তখন শিলালিপিটির পাঠ তার খাতায় লিখে নিয়েছিলেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

খাকী শাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজি সিরাজুল ইসলামের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শিলালিপিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধান পেলে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে জানানো হবে।

মনোয়ার খাঁর মসজিদের শিলালিপি

মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঈশা খাঁর বংশধর মনোয়ার খাঁ। সিদ্দিকবাজার জামে মসজিদ ও মনোয়ার খাঁ মসজিদ নামে পরিচিত। ঈশা খাঁর বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মসজিদের মতো মনোয়ার খাঁ মসজিদের শিলালিপি ও নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ। মনোয়ার খাঁ মসজিদের অবস্থান বংশাল থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১ সিদ্দিকবাজার রোডে।

মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে তিনটি দরজা। উঁচু পাকা ভিত্তির উপর ছিল মসজিদের মূল কক্ষ। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ পরিচালনা কমিটির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ১৯৭৫ সালে প্রথম মসজিদের সংস্কারের কাজ করা হয়। এরপর ১৯৮৫ সালে মূল মসজিদটি ভাঙ্গা হয়। বর্তমানে এ স্থানে একটি পাঁচতলা আধুনিক মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে। যার নীচতলায় চারপাশে দোকান ভাড়া দেয়া রয়েছে।

মসজিদ পরিচালনা কমিটি সূত্র আরো জানায়, মসজিদের পাশে মোতাওয়াল্লিদের কবরস্থান ছিলো। ১৯৭৫ সালে তা ভেঙ্গে বাথরুম করা হয়। ১৯৮১ সালে মূল মসজিদের সিঁড়ি ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করা হয়। মসজিদের শিলালিপি ছিলো। কিন্তু সংস্কারের পর আর তা পাওয়া যায়নি।

হাশেম সূফী জানান, বিগত শতাব্দির আশির দশকে তিনি মসজিদটিতে শিলালিপি স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন। শিলালিপিটির ভাষা ছিল ফারসি। কালো পাথরের উপর লেখা। প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি।

মসজিদটি সম্পর্কে 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়: *সিদ্দিকবাজার ও মনর খাঁ বাজারের সংযোগস্থলে যে দ্বিতল মসজিদটি আজ সিদ্দিকবাজার জামে মসজিদ নামে পরিচিত সেটি মুনাওয়ার খাঁ প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিলেন বিধায় মসজিদটি তার নামেই বহুকাল ধরে পরিচিত রয়েছে। আজও ঢাকাবাসির অনেকেই মনর খাঁ মসজিদ নামে অভিহিত করে। কি কারণে মহল্লাবাসী মনোয়ার খাঁ মসজিদের নাম নাম পরিবর্তন করলেন জানি না। তবে মুনাওয়ার খাঁ রোডের পরিবর্তে যেমন হাজী ওসমান গনি রোড হয়েছে, তেমনি এটাও সাধারণ মহল্লাবাসী করে নিয়েছে বলে ধারণা করছি। এখানেও ইতিহাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে মনে করি।*

সিদ্দিকবাজার, ফুলবাড়িয়া, হাজি ওসমান গনি রোড, খাজা নাজিমউদ্দিন রোড, কার্জন হল ইত্যাদি এলাকায় মুঘল আমলে বসতি স্থাপন করেছিলেন ঈশা খাঁর বংশধর এবং তাদের সহযোগীরা। উল্লিখিত অঞ্চলে কার্জন হলের মুসা খাঁর মসজিদ, মনোয়ার খাঁ মসজিদ, তাঁতখানা লেন মসজিদ, নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদ ইত্যাদি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। রয়েছে বংশধরদের মাজার। এর মধ্যে শিলালিপি রয়েছে একমাত্র নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদের। তবে শিলালিপিতে সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে। মসজিদটির প্রতিষ্ঠার কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। উল্লিখিত অঞ্চলের প্রাচীন মসজিদ প্রতিষ্ঠা বা প্রাচীন মাজারের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি।

শাহজাদী বেগম মসজিদের শিলালিপি

শাহজাদী বেগম মসজিদের অবস্থান কোতোয়ালি থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ডে।

হোল্ডিং নাম্বার ৪৫ বাগডাসা লেন। বাগডাসা মহল্লাটি আরমানিটোলার পূর্বদিকে এবং নয়াবাজারের দক্ষিণ-পূর্বদিকে।

বাগডাসা লেন মহল্লাটিতে তিনটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। মসজিদ তিনটি হচ্ছে সামসাবাদ-বাগডাসা লেন মসজিদ, বাগডাসা লেন ছোট মসজিদ এবং শাহজাদী বেগম মসজিদ। এর মধ্যে শাহজাদী বেগম মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়ে যায় ২০০৬ সালে। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ। মহল্লার অন্য দুটি প্রাচীন মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মসজিদের আদি কাঠামো ছিল এক-গম্বুজ বিশিষ্ট। শিলালিপিটি মসজিদের মূল প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল। রং কালো। ২০০৬ সালে মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন বহুতল ভবন তৈরি করা হয়। শাহজাদী বেগম মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজি আবদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শিলালিপিটির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেবেন বলে জানান এবং পাওয়া গেলে আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ করে দেবেন উল্লেখ করেন। পরে তিনি জানিয়ে দেন, পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ফেলার পর থেকে শিলালিপিটি আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী বিগত শতাব্দীর আশির দশকে শিলালিপিটির পাঠ খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শিলালিপিতে মসজিদের নির্মাণ সাল ১২৮৭ হিজরি বলে উল্লেখ ছিল।

নবরায় মসজিদের শিলালিপি

ইসলামপুর এবং তাঁতীবাজার সংলগ্ন নবরায় লেন এলাকায় রয়েছে দু'টি প্রাচীন মসজিদ। দু'টির প্রাচীন কাঠামো এখন আর নেই। ভাঙ্গার আগে মসজিদ দু'টির দেয়ালে শিলালিপি স্থাপন করা ছিল। শিলালিপি দু'টি এখন নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি পূর্ণাঙ্গ কোন পাঠ।

কোতোয়ালী থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৪ নবরায় লেনে চারচালা বিশিষ্ট মসজিদটি বর্তমানে নবরায় লেন বড় মসজিদ এবং ১ নবরায় লেনে এক-গম্বুজ বিশিষ্ট নবরায় লেন ছোট মসজিদ নামে পরিচিত। ইতিহাসবিদদের মতে, মসজিদ দু'টির মধ্যে নবরায় লেন বড় মসজিদ অধিক প্রাচীন।

এ সম্পর্কে 'আসুদগানে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে: *নির্মাণ ও স্থাপত্য কৌশল দেখে মনে হয়, এটি নবাব ইসলাম খান মসজিদের চেয়ে প্রাচীন। এর পাশে মসজিদের পশ্চিমে বর্তমান লায়ন সিনেমার আঙ্গিনার ভেতর যে মাজারটি বিদ্যমান, তা মসজিদ নির্মাতারই হবে। বর্তমানে সংরক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন এই সমাধিক্ষেত্রটি হযরত আলাইহে রহমতুল্লাহর মাজারের ৫০ গজ দূরে অবস্থিত। তখন হয়ত দু'টি মসজিদের প্রয়োজন ছিল।*
'আসুদেগানে ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখিত মাজারটি এখন আর নেই। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পর মাজারের স্থলে বহুতল মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ দু'টির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে বহুতল মসজিদ ভবন।

নবরায় লেন এলাকা সম্পর্কে হাশেম সূফী বলেন, মসজিদটির চারপাশে ছিল বিশাল উন্মুক্ত চত্বর। মুঘল আমলে লায়ন সিনেমা হল থেকে নবরায় লেন বড় ও ছোট মসজিদটি পর্যন্ত ছিল মুসলিম কবরস্থান।

হাশেম সূফী আরো বলেন, চৌচালা মসজিদের মূল প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। ভাষা ছিল ফারসি। আশির দশকেও শিলালিপিটি দেখা গেছে।

হাশেম সূফী আরো জানান, এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের দেয়াল ছিল ৩ ফিট পুরো। মসজিদের মূল প্রবেশপথের ওপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি।

এ ব্যাপারে মসজিদ দু'টির ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা শিলালিপি বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকেন এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটি সভাপতির সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। নবরায় লেনের দু'টি মসজিদেরই পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ইসলামপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজি শামসুল হক। মসজিদ এবং হাজি শামসুল হকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বার বার গিয়েও তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

শাহজাদা মিয়া লেন মসজিদের শিলালিপি

ইসলামপুর রোডের দক্ষিণে বাদামতলী এলাকায় শাহজাদা মিয়া লেন মসজিদের শিলালিপিটি নিখোঁজ হয় পুরাতন ভবন ভাঙ্গার পর থেকে। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ। কোতোয়ালি থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪ শাহজাদা মিয়া লেনের প্রাচীন এই মসজিদটির নতুন

ভবন নির্মাণের পর মসজিদটির নাম দেয়া হয়েছে ফাতেমা খাতুন জামে মসজিদ। তবে স্থানীয়ভাবে মসজিদটি শাহজাদা মিয়া লেন নামেই বেশি পরিচিত।

মসজিদের বর্তমান মোতাওয়াল্লি মাহবুবল আলম জানান, ফাতেমা খাতুন মসজিদের সংস্কারক ও সাবেক মোতাওয়াল্লি মতিউর রহমানের স্ত্রী। মতিউর রহমান ১৩৩৩ সালে মসজিদের পাশ্ববর্তী জায়গাসহ মসজিদটি ক্রয় করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মসজিদটি ওয়াকফ্ করে দেন। তিনি আরো জানান, শিলালিপিটি প্রাচীন মসজিদের প্রবেশপথের ওপর স্থাপন করা ছিল।

লেখক ও গবেষক মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী বিগত শতাব্দির আশির দশকের মধ্যভাগে শাহজাদা মিয়া লেন মসজিদ পরিদর্শনকালে শিলালিপিটি পর্যবেক্ষণ করেন। খাতায় লিখে রাখেন প্রাচীন কাঠামোর বিবরণ। তিনি জানান, এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল, মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর মতিউর রহমান নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পুনরায় সংস্কার করেন। সংস্কারের তারিখ ১৩৪৪ হিজরি। শিলালিপিতে আবজাদ হিসেবে সংস্কারের তারিখ দেয়া হয়। শিলালিপিতে উল্লেখিত 'ফুয়ূযাতে ইলাহি' (আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ) শব্দের আবজাদ হিসেবে ১৩৪৪ হয়।

নর্থব্রুক হল রোড মসজিদের শিলালিপি

স্বাধীনতার পরপর নিখোঁজ হয়ে যায় বাংলাবাজার এলাকার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ নর্থব্রুক হল রোড মসজিদের শিলালিপি। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ। মসজিদটির অবস্থান সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে, ১৪ নর্থব্রুক হল রোডে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'মসজিদ নির্দেশিকা' বইতে এ মসজিদকে মুঘল আমলের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আদি মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী মুঘলপূর্ব বা সুলতানি আমলের ছিলো বলে অভিমত ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হাশেম সূফীর।

হাশেম সূফী বলেন, এক গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট্ট প্রায় বর্গাকৃতি মসজিদটির দেওয়াল ছিলো ফুট আষ্টেক পুরু। কালো পাথরের শিলালিপিটি সাঁটানো ছিলো প্রবেশ পথের উপরের দেওয়ালে। হাসেম সূফীর এই বর্ণনার সাথে একমত মসজিদ কমিটি। তবে শিলালিপির বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমত আছে তাদের। শিলালিপি থাকার কথা অস্বীকার করে মসজিদ কমিটির সভাপতি কাজী আনোয়ার হোসেন বলেন, এ মসজিদে শিলালিপি নেই, কখনও ছিলো না। তবে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ১৯৭৪ সালে এ মসজিদ সংস্কারের কাজ শুরু হয় বলে জানান কাজী আনোয়ার।

হাশেম সূফীর ধারণা, ওই সংস্কারের সময়েই শিলালিপিটি ভেঙ্গে বা হারিয়ে যায়।

যদিও সংস্কার শুরুর সময় নিয়ে ভিন্ন তথ্য দিচ্ছে মসজিদ নির্দেশিকা। বইটিতে বলা হচ্ছে, ১৯৬৬ সালে ভেঙে ফেলা হয় এক গম্বুজ বিশিষ্ট মুঘল মসজিদটি।

আদি মসজিদের বর্ণনা দিয়ে কাজী আনোয়ার বলেন, আদি মসজিদটি ছিলো রাস্তা থেকে কিছুটা উঁচুতে। দেয়াল ছিলো সাত থেকে আট ফুট পুরু। ছিলো পাতলা ইটে চুন-সুরকির গাঁথুনি। একটাই গম্বুজ ছিলো মসজিদে। এর বিস্তৃতি ছিলো পুরো ছাদ জুড়ে।

মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান (৬৩) জানান, ওই গম্বুজটাই ছিলো মসজিদের ছাদ।

বর্তমানে মসজিদের পশ্চিম পাশে বাংলাবাজার গার্লস হাই স্কুল (১৯১৪)। পূর্বদিক ঘেঁষে নর্থব্রুক হল রোড চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। দক্ষিণ ঘেঁষে বাড়ি, বাড়ির পর বাড়ি। আরো দক্ষিণে দোকান, তারপর নর্থব্রুক হল বা লালকুঠি। মসজিদের উত্তরে মাত্র তিনটা বাড়ি পরেই ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লার বাড়ি। আরো উত্তরে এ রোডের মাথায় নান্নী বিবির মসজিদ, তারপর ভিক্টোরিয়া পার্ক।

প্যারিদাস রোড জামে মসজিদ

ফারসি ভাষার শিলালিপি। আয়তাকার কালো পাথরে খোদাই করা। ১০৬৯ হিজরি বা ১৬৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী জনপদ বাংলাবাজার এলাকায় মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। বর্তমান অবস্থান সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজারে। মসজিদটির বর্তমান দাপ্তরিক নাম বায়তুন নূর জামে মসজিদ। তবে মসজিদটি প্যারিদাস রোড মসজিদ নামেই বেশি পরিচিত।

ঢাকার অন্যতম প্রাচীন জনপদ বাংলাবাজারকে ব্রিটিশ আমলে কয়েকটি ভাগে নতুন নামকরণ করা হয়। এর মধ্যে ১৯১৬ সালে ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান রায়

বাহাদুর প্যারিদাস বাবুর নামানুসারে প্যারিদাস রোডের নামকরণ করা হয়।

প্যারিদাস রোড মসজিদের শিলালিপি সম্পর্কে হাশেম সূফী জানান, আদি কাঠামো ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের দেয়াল ছিল ৮ ফিট পুরু। মসজিদটিতে দুটি শিলালিপি ছিল। একটি প্রতিষ্ঠার শিলালিপি এবং একটি সংস্কারের শিলালিপি। তিনি আরো জানান, মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার আগে দু'টি শিলালিপি তিনি মসজিদের দেয়ালে দেখেছেন।

মসজিদে বর্তমানে প্রতিষ্ঠার শিলালিপিটি রয়েছে। সংস্কারের শিলালিপিটি নিখোঁজ। এ ব্যাপারে মসজিদের ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংস্কারের শিলালিপিটি ছিল না বলে উল্লেখ করেন।

কলতাবাজার গাড়িখানা মসজিদের শিলালিপি

কলতাবাজার গাড়িখানা মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দির আশির দশকের পর। তখন মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। গাড়িখানা মসজিদের শিলালিপির পাঠ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশ হয়নি। সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ২ কাজী আব্দুর রউফ রোডে মসজিদটির অবস্থান।
কলতাবাজারে ব্রিটিশ আমলে মোটরগাড়ির গ্যারেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কলতাবাজারের এই অঞ্চলটি ক্রমান্বয়ে কলতাবাজার গাড়িখানা নামে পরিচিত হয়ে উঠে। মসজিদটি পরিচিতি লাভ করে গাড়িখানা মসজিদ হিসেবে।

আশির দশকে মসজিদ-মাজারের শিলালিপির পাঠ সংগ্রহকালে মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী গাড়িখানা মসজিদের শিলালিপির পাঠ লিপিবদ্ধ করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। মসজিদটি ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। পূর্বদিকের প্রবেশপথের ওপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। ভাষা ফারসি। কালো পাথরের ওপর লেখা ছিল।

শিলালিপি অনুসারে, রেযার পুত্র সাদেক ১২১৩ হিজরি/১৭৯৮-৯৯ খ্রিঃ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

গাড়িখানা মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে মসজিদ পরিচালনা কমিটি এবং ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা প্রথমে জানান, শিলালিপিটি রক্ষিত আছে। কিন্তু পরবর্তীতে জানান, এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সোনা মিয়া মসজিদ

কলতাবাজার এলাকার অন্যতম মসজিদ সোনা মিয়া মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে ১৯৯৩ সালে। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পাঠ। মসজিদটির বর্তমান দাপ্তরিক নাম সোনা মিয়া আল ফালাহ মসজিদ। তবে স্থানীয়ভাবে সোনা মিয়া মসজিদ নামেই বেশি পরিচিত। সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ৮ রঘুনাথ দাস লেনে মসজিদটির অবস্থান।
স্থানীয়দের মতে, প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে মসজিদটির নাম হয়েছে সোনা মিয়া মসজিদ। তবে শিলালিপি না থাকায় প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার সময় সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। অ্যাডভোকেট সুলতান আহমদসহ স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে ছিল তিনটি দরজা। মাঝের দরজার ওপরে দেয়ালে শিলালিপি স্থাপন করা ছিল। রং ছিল কালো এবং প্রায় দেড় ফুট লম্বা ছিল শিলালিপিটি। ১৯৯৩ সালে মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। এরপর থেকে মসজিদের শিলালিপিটি নিখোঁজ।

মসজিদের মোতাওয়াল্লি হাজি নাসিরউদ্দিন আহমদ বাচ্চুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কমিটিকে জানান, মসজিদের প্রাচীন ভবন ভাঙ্গার সময় শিলালিপির কী হয়েছে এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

হায়াত বেপারীর মসজিদের শিলালিপি

দোলাই নদী তীরবর্তী প্রাচীন মসজিদগুলোর অন্যতম হায়াত বেপারীর মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দির নব্বই দশকে শুরুতে মসজিদের পূর্ববর্তী কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের পর থেকে। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটি কোন পাঠ।

মসজিদটির অবস্থান এককালের শাহউজিয়াল নগর মহল্লায়, যা বর্তমানে হৃষিকেশ দাস রোড নামে পরিচিত। সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের হৃষিকেশ দাস রোডে মসজিদটির অবস্থান। দোলাই নদীর উপর নির্মিত নারিন্দা সেতুর উত্তরদিকে ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ বিনত বিবি মসজিদের অবস্থান। আর সেতুর দক্ষিণ দিকে হায়াত বেপারীর মসজিদ। বিনত বিবি মসজিদের মতো হায়াত বেপারী মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদটি হায়াত বেপারী ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও গবেষকদের মতে, শিলালিপিটি ছিল ফারসি ভাষার, পাথরের রং ছিল কালো। মূল প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী ও হাশেম সূফী বিগত শতাব্দির আশির দশকে হায়াত বেপারী মসজিদের শিলালিপিটি মসজিদের দেয়ালে স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছেন। মওলানা রফিকুল ইসলাম আশির দশকে কিছুদিন হায়াত বেপারীর মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। মওলানা রফিকুল ইসলাম জানান, ১৯৮৮ সালে তিনি মসজিদের দেয়ালে শিলালিপিটি দেখেছেন।

এ ব্যাপারে মসজিদ পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হলে তারা এক পর্যায়ে শিলালিপিটি খুঁজে বের করার আশ্বাস দেন এবং পরে কর্মকর্তারা জানান, শিলালিপিটি পাওয়া যাচ্ছে না। মসজিদ কমিটির কর্মকর্তারা আরো জানান, মসজিদ ভাঙ্গার পর থেকেই শিলালিপিটি নিখোঁজ।

পাঁচভাই ঘাট লেন মসজিদের শিলালিপি

রোকনপুর পাঁচ ভাই ঘাট লেন মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে নব্বইয়ের দশকের পর। দোলাই খাল তীরবর্তী মহল্লা পাঁচভাই ঘাট লেন এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ এটি। পাঁচভাই ঘাট লেন মসজিদের শিলালিপির কোন পাঠ পাওয়া যায়নি। সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ২৮ পাঁচভাই ঘাট লেনে মসজিদটির অবস্থান।

মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী ও হাশেম সূফী প্রমুখ বিগত শতাব্দির আশির দশকে প্রাচীন মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে জরিপ করার সময় শিলালিপি মসজিদে স্থাপন করা অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি জানান, মসজিদের প্রাচীন এক গম্বুজ বিশিষ্ট কাঠামোর পূর্বদিকে প্রবেশপথের ওপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি।

মসজিদ কমিটির কর্মকর্তারা জানান, মসজিদের এক গম্বুজ বিশিষ্ট কাঠামোটি ১৯৮৭ সালে ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হলে মসজিদ কমিটির কর্মকর্তারা শিলালিপি থাকার বিষয় কখনো অস্বীকার করেছেন, আবার কখনো বলেছেন, নতুন কাঠমো নির্মাণের আগে তারা কমিটিতে ছিলেন না। ফলে শিলালিপি বিষয়ে তারা কিছু জানেন না।

গোয়ালঘাট মসজিদ

দোলাই নদী তীরবর্তী প্রাচীন মসজিদসমূহের অন্যতম গোয়ালঘাট মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে ২০০৩ সালের পর। দোলাই খাল এলাকায় ১৯ গোয়ালঘাট লেনের এই মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ভেঙ্গে নতুন বহুতল ভবন তৈরি করা হয়। এরপর থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ।
নাজির হোসেন তার 'কিংবদন্তির ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, *ধোলাই খালের পারে পাঁচভাই ঘাটের নিকট গোয়ালঘাট নামে একটি ঘাট ছিলো। এ ঘাটে গোয়ালারা গ্রাম-গঞ্জ থেকে দুধ নিয়ে আসতো। তজ্জন্য এই ঘাটের নাম হয়েছিল গোয়ালঘাট। আর ঘাটের নাম অনুসারে আশে-পাশের বসতিটিও গোয়ালঘাট নামে পরিচিত হয়। এ ঘাটের অতি নিকটে নবাবপুরের রথখোলার মোড়ে ছিলো দুধের আড়ৎ। ধোলাই খাল ভরাট হয়ে খালের চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে গেলেও গোয়ালঘাট নাম এবং দুধের আড়ৎ বিদ্যমান রয়েছে।*

হাশেম সূফী জানান, কোম্পানী আমলের মসজিদ। প্রাচীন কাঠামো ছিল তিন-গম্বুজ বিশিষ্ট। মূল প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। ভাষা ছিল ফারসি। প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের আগ পর্যন্ত শিলালিপিটি দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে মসজিদ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা মসজিদের শিলালিপিটি খুঁজে পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন।

মৈশুণ্ডির দু'টি মসজিদের শিলালিপি

প্রাক মুঘল জনপদ মৈশুণ্ডিতে দু'টি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। সূত্রাপুর থানায় সিটি (দক্ষিণ) করপোরেশনের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদ দু'টি হচ্ছে দক্ষিণ মৈশুণ্ডি বড় মসজিদ ও দক্ষিণ মৈশুণ্ডি ছোট মসজিদ। বিগত শতাব্দির আশির দশক পর্যন্ত দু'টি মসজিদের দেয়ালেই স্থাপন করা ছিল শিলালিপি। নব্বই দশকের শুরু থেকে এ দু'টি শিলালিপি নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি এগুলোর কোন পাঠ।

দক্ষিণ মৈশুণ্ডি বড় মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দির নব্বইয়ের দশকে মসজিদের আদি কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের পর। ৫৭, ৫৭/১,

৫৮, লালমোহন সাহা স্ট্রিটের এই মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। হাশেম সূফী জানান, শিলালিপিটি মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর মূল ভবনের প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল। শিলালিপিটি রং ছিল কালো এবং ভাষা ছিল ফারসি।

মৈশুণ্ডি বড় মসজিদ মসজিদ পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধায়ক শহীদুল ইসলাম বিপ্লব জানান, ১৯৯০ সালে মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ভাঙ্গা শুরু হয়। নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৯৯৫ সালে এবং নির্মাণ সমাপ্ত হয় ২০০১ সালে। প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার পর থেকে শিলালিপিটি পাওয়া যাচ্ছে না।

শহীদুল ইসলাম বিপ্লব আরো জানান, প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার পর শিলালিপিটি ফকিরেরপুল এলাকায় নিয়ে পেশাদার অনুবাদক দ্বারা পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করা হয়েছিল। তিনি আরো জানান, শিলালিপি ও শিলালিপির পাঠটি তারা খুঁজেছেন। কিন্তু তারা বর্তমানে খুঁজে পাচ্ছেন না।

মৈশুণ্ডির অপর প্রাচীন মসজিদ দক্ষিণ মৈশুণ্ডি ছোট মসজিদটি চিনিটিকরি মসজিদ নামেও পরিচিতি রয়েছে। ৯৩ লালমোহন সাহা রোডের এই মসজিদটির আদি কাঠামো ছিল ৫ গম্বুজ বিশিষ্ট। কোম্পানি আমলে মসজিদটিকে চিনিটিকরি দিয়ে সাজানো হয়। তখন থেকে মসজিদটি চিনিটিকরি মসজিদ নামে পরিচিতি পায়।

দক্ষিণ মৈশুণ্ডি ছোট মসজিদে আশির দশকে কিছুদিন ইমামের দায়িত্ব পালন করেন মওলানা রফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, আশির দশকে শিলালিপিটি মসজিদের দেয়ালে স্থাপন করা ছিল।

দক্ষিণ মৈশুণ্ডি ছোট মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজি আবদুল মালেক জানান, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের প্রাচীন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হয়। তিনি আরো বলেন, আদি ভবন ভাঙ্গার সময় শিলালিপিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সংরক্ষণ করা হয়নি। আদি ভবনটি ভাঙ্গার পর থেকে মসজিদের শিলালিপি আর পাওয়া যাচ্ছে না।

আলমগঞ্জ নদীর পাড় মসজিদ

আলমগঞ্জ নদীরপাড় মসজিদের শিলালিপি নিকোঁজ হয়েছে নব্বই দশকে। গেন্ডারিয়া থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কপোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩ আলমগঞ্জ রোডে মসজিদটির অবস্থান। আলমগঞ্জের তিনটি প্রাচীন মসজিদের মধ্যে এ মসজিদটির অবস্থান বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। তাই মসজিদটি স্থানীয়ভাবে আলমগঞ্জ নদীরপাড় মসজিদ নামে পরিচিত। তবে এটির বর্তমান দাপ্তরিক নাম জাহাঙ্গীর বাদশা জামে মসজিদ। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে মসজিদ কর্তৃপক্ষ এ নাম দেয়া দিয়েছে।

মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে ছিল তিনটি দরজা। হাশেম সূফী জানান, শিলালিপি স্থাপন করা ছিল মসজিদের মাঝের দরজার উপরের দেয়ালে। রং ছিল কালো এবং ভাষা ছিল ফারসি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বিগত শতাব্দির আশির দশকেও মসজিদের দেয়ালে শিলালিপিটি দেখা গেছে।

মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর দেয়ালের একটি অংশবিশেষ ছাড়া এখন আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন কাঠামোর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের দেয়াল অক্ষত রেখে বাকি অংশ ভেঙ্গে তৈরি করা হয়েছে নতুন মসজিদ ভবন। নতুন কাঠামো তৈরির পর থেকেই শিলালিপিটি নিখোঁজ।

আলমগঞ্জ নদীর পাড় মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজি মোহাম্মদ সেলিমের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি শিলালিপিটির অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে বলেন, এ বিষয়ে কোন তথ্য তার জানা নেই।

আলমগঞ্জ মসজিদের শিলালিপি

প্রাক মুঘল জনপদ আলমগঞ্জে তিনটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। গেন্ডারিয়া থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে মসজিদ তিনটির অবস্থান। এর মধ্যে ২৮ আলমগঞ্জ রোডের মসজিদটির শিলালিপি (প্রতিষ্ঠা ১১১৯ হিজরি/১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে আছে। আলমগঞ্জের অপর দু'টি প্রাচীন মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপি দু'টির কোন পাঠ।

মসজিদটির তিনটির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন বহুতল ভবন তৈরি করা হয়েছে। শুধু ৩৩ আলমগঞ্জ রোডের মসজিদটির প্রাচীন কাঠামোর পশ্চিম দেয়ালের অংশবিশেষ বিদ্যমান।

আলমগঞ্জের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী, পশ্চিমে দোলাই নদী এসে মিশতো বুড়িগঙ্গায়। পূর্বে পোস্তাগোলা। প্রাক মুঘল

জনপদ আলমগঞ্জে পাঠান আমলে ছিল বেগ মুরাদের দুর্গ। মুঘল আমলেও সেখানে দুর্গ ছিল। কোম্পানি আমলে সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে আলমগঞ্জের নামকরণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিরোধ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, মুঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীরের (আওরঙ্গজেব) নামানুসারেই আলমগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, বাদশাহ আলমগীর ক্ষমতায় আসার আগেই আলমগঞ্জ নাম ছিল।

৩ নম্বর রোডের আলমগঞ্জ মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে দরজা ছিলো তিনটি। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন মসজিদ ভবনের উদ্বোধন করা হয়।

হাশেম সূফী জানান, প্রাচীন এই মসজিদটির প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। কালো পাথরের উপর লেখা। ভাষা ছিল ফারসি। মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার আগে পর্যন্ত শিলালিপিটি দেখা দেখা গেছে।

মসজিদ কমিটি সাধারণ সম্পাদক আলহাজ গোলাম মোহাম্মদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মসজিদে শিলালিপি থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, মসজিদটিতে তিনি কখনও শিলালিপি দেখেননি।

কেবি রোড ছাতা মসজিদ

প্রাচীন এই মসজিদটির আদি কাঠামো ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। প্রাচীন কাঠামোর পূর্বদিকে ছিল তিনটি দরজা। হাশেম সূফী জানান, মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর মূল প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। কালো পাথরে লেখা। ভাষা ছিল ফারসি। শিলালিপিটি বর্তমানে নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপির কোন পাঠ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কেবি রোডে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদটিতে একটি মিনার ছিল। তাই স্থানীয়ভাবে মসজিদটি ছাতা মসজিদ নামে পরিচিত। সম্প্রতি মসজিদটি সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, মসজিদের প্রাচীন এক গম্বুজ বিশিষ্ট কাঠামোটি ভাঙ্গা হচ্ছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান, মসজিদের নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গা হচ্ছে।

মসজিদের মোতাওয়াল্লি সালাউদ্দিন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মসজিদটি প্রায় দুইশ' বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মসজিদটিতে কোন শিলালিপি থাকার কথা তার জানা নেই।

লোহারপুল মসজিদের শিলালিপি

লোহারপুল এলাকার অন্যতম প্রাচীন স্থাপনা লোহারপুল মসজিদের শিলালিপি এবং মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরাফতউল্লাহর মাজারের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে নব্বই দশকের পর। পাওয়া যায়নি শিলালিপি দু'টির কোন পাঠ। মসজিদটির অবস্থান গেন্ডারিয়া থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কেশব ব্যানার্জি রোডে।

লোহারপুল মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে ছিল তিনটি দরজা। মসজিদের মূল ভবনের পূর্বদিকে ছিল মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরাফতউল্লাহর মাজারসহ কয়েকটি কবর। গেন্ডারিয়া থানায় শরাফতগঞ্জ হাজি শরাফতউল্লাহ নামে নামকরণ হয়েছে।

২০০০ সালের পর মসজিদটির ব্যাপক সংস্কার হয়। মূল মসজিদ ভবনের তিনদিকে পাকা স্থাপনা সম্প্রসারণ করা হয়। মাজারের স্থলে নির্মাণ করা হয় মসজিদ ভবন ।

হাশেম সূফী জানান, বিগত নব্বই দশকের শুরুতে লোহারপুল মসজিদ ও মাজারের শিলালিপি মসজিদ ও মাজারে স্থাপন করা ছিল। শিলালিপি দু'টি ছিল ফারসি ভাষার। মসজিদ ভবনের মূল প্রবেশপথের উপর শিলালিপিটি স্থাপন করা ছিল। আর শরাফতউল্লাহ-এর মাজারসৌধে স্থাপন করা ছিল মাজারের শিলালিপিটি।

হাশেম সূফী আরো বলেন, মসজিদের সংস্কারের সময় তৎকালীন মোতাওয়াল্লি মুসা ভাইকে অনুরোধ করেছিলাম শিলালিপিটি সংরক্ষণ করতে। কিন্তু মসজিদ সংস্কারের পর শিলালিপি দু'টি আর পাওয়া যাচ্ছে না।

লোহারপুল মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর শহীদুল্লাহ মিনুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মসজিদে শিলালিপি থাকার বিষয়টি তিনি শোনেননি।

জনপদ আলমগঞ্জে পাঠান আমলে ছিল বেগ মুরাদের দুর্গ। মুঘল আমলেও সেখানে দুর্গ ছিল। কোম্পানি আমলে সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে আলমগঞ্জের নামকরণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিরোধ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, মুঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীরের (আওরঙ্গজেব) নামানুসারেই আলমগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, বাদশাহ আলমগীর ক্ষমতায় আসার আগেই আলমগঞ্জ নাম ছিল।

৩ নম্বর রোডের আলমগঞ্জ মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে দরজা ছিলো তিনটি। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন মসজিদ ভবনের উদ্বোধন করা হয়।

হাশেম সূফী জানান, প্রাচীন এই মসজিদটির প্রবেশপথের উপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। কালো পাথরের উপর লেখা। ভাষা ছিল ফারসি। মসজিদের প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গার আগে পর্যন্ত শিলালিপিটি দেখা দেখা গেছে।

মসজিদ কমিটি সাধারণ সম্পাদক আলহাজ গোলাম মোহাম্মদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মসজিদে শিলালিপি থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, মসজিদটিতে তিনি কখনও শিলালিপি দেখেননি।

কেবি রোড ছাতা মসজিদ

প্রাচীন এই মসজিদটির আদি কাঠামো ছিল এক গম্বুজ বিশিষ্ট। প্রাচীন কাঠামোর পূর্বদিকে ছিল তিনটি দরজা। হাশেম সূফী জানান, মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর মূল প্রবেশপথের উপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপিটি। কালো পাথরে লেখা। ভাষা ছিল ফারসি। শিলালিপিটি বর্তমানে নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপির কোন পাঠ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কেবি রোডে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদটিতে একটি মিনার ছিল। তাই স্থানীয়ভাবে মসজিদটি ছাতা মসজিদ নামে পরিচিত। সম্প্রতি মসজিদটি সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, মসজিদের প্রাচীন এক গম্বুজ বিশিষ্ট কাঠামোটি ভাঙ্গা হচ্ছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান, মসজিদের নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গা হচ্ছে।

মসজিদের মোতাওয়াল্লি সালাউদ্দিন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মসজিদটি প্রায় দুইশ' বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। মসজিদের শিলালিপি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মসজিদটিতে কোন শিলালিপি থাকার কথা তার জানা নেই।

লোহারপুল মসজিদের শিলালিপি

লোহারপুল এলাকার অন্যতম প্রাচীন স্থাপনা লোহারপুল মসজিদের শিলালিপি এবং মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরাফতউল্লাহর মাজারের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে নব্বই দশকের পর। পাওয়া যায়নি শিলালিপি দু'টির কোন পাঠ। মসজিদটির অবস্থান গেন্ডারিয়া থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কেশব ব্যানার্জি রোডে।

লোহারপুল মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। সামনে ছিল তিনটি দরজা। মসজিদের মূল ভবনের পূর্বদিকে ছিল মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরাফতউল্লাহর মাজারসহ কয়েকটি কবর। গেন্ডারিয়া থানায় শরাফতগঞ্জ হাজি শরাফতউল্লাহ নামে নামকরণ হয়েছে।

২০০০ সালের পর মসজিদটির ব্যাপক সংস্কার হয়। মূল মসজিদ ভবনের তিনদিকে পাকা স্থাপনা সম্প্রসারণ করা হয়। মাজারের স্থলে নির্মাণ করা হয় মসজিদ ভবন ।

হাশেম সূফী জানান, বিগত নব্বই দশকের শুরুতে লোহারপুল মসজিদ ও মাজারের শিলালিপি মসজিদ ও মাজারে স্থাপন করা ছিল। শিলালিপি দু'টি ছিল ফারসি ভাষার। মসজিদ ভবনের মূল প্রবেশপথের উপর শিলালিপিটি স্থাপন করা ছিল। আর শরাফতউল্লাহ-এর মাজারসৌধে স্থাপন করা ছিল মাজারের শিলালিপিটি।

হাশেম সূফী আরো বলেন, মসজিদের সংস্কারের সময় তৎকালীন মোতাওয়াল্লি মুসা ভাইকে অনুরোধ করেছিলাম শিলালিপিটি সংরক্ষণ করতে। কিন্তু মসজিদ সংস্কারের পর শিলালিপি দু'টি আর পাওয়া যাচ্ছে না।

লোহারপুল মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর শহীদুল্লাহ মিনুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মসজিদে শিলালিপি থাকার বিষয়টি তিনি শোনেননি।

নারিন্দা ছোট মসজিদ

নারিন্দা অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ নারিন্দা ছোট মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ হয়েছে বিগত শতাব্দির নব্বইয়ের দশকে। ৪৬ নারিন্দা রোডের এ মসজিদটি স্থানীয়ভাবে নারিন্দা ছোট মসজিদ নামে পরিচিত হলেও দাপ্তরিক নাম নারিন্দা জরীপ বেপারী জামে মসজিদ। মসজিদের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ১৯৯৪ সালে প্রাচীন কাঠামো ভাঙ্গা হয়। এরপর থেকে শিলালিপিটি নিখোঁজ। পাওয়া যায়নি শিলালিপিটির কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

নারিন্দা প্রাক মুঘল জনপদ। সেখানে মসলিন উৎপাদন হতো বলে জনশ্রুতি আছে। গবেষকদের মতে, নারিন্দার প্রাচীন নাম ছিল নারায়ণদিয়া। নারায়ণদিয়ার অর্থ নারায়ণের দ্বীপ বা ঈশ্বরের দ্বীপ। কোম্পানি আমলে ইংরেজরা অঞ্চলটিকে তাদের কাগজপত্রে নারিন্দা হিসেবে উল্লেখ করতে থাকে এবং পরবর্তীকালে অঞ্চলটি নারিন্দা নামে পরিচিতি হয়ে উঠে।

হাশেম সূফী জানান, নারিন্দা ছোট মসজিদ কোম্পানি আমলে তৈরি। মসজিদের প্রাচীন কাঠামোটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। হাজি জরীফ বেপারী মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের প্রাচীন কাঠামোর মূল প্রবেশপথের উপরে শিলালিপিটি স্থাপন করা ছিল। শিলালিপিটির ভাষা ছিল ফারসি।

নারিন্দা ছোট মসজিদের নিখোঁজ শিলালিপি বিষয়ে মসজিদের ইমাম মওলানা রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মসজিদে শিলালিপি ছিল না। জাহিদ হোসেনসহ নারিন্দা ছোট মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, মসজিদে শিলালিপিটি খুঁজে দেখছেন এবং সন্ধান পেলে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে জানানো হবে।

তাঁতীবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি

মসজিদ থেকে খুলে রাখা শিলালিপি কমিটির সদস্যদের দেখিয়ে পরে তা সরিয়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে তাঁতীবাজার ছোট মসজিদে। মসজিদটির অবস্থান তাঁতীবাজার মহল্লায় ২৪ প্রসন্ন পোদ্দার লেনে কতোয়ালী থানায়।

ঢাকার প্রাচীন এলাকাগুলোর অন্যতম তাঁতীবাজার বস্তুত একটি শিল্প এলাকা ছিলো। এখানে বসবাস ছিলো দক্ষ তাঁতীদের। ১৯২১ সালে তাঁতীবাজারের নাম পাল্টে প্রসন্ন পোদ্দার লেন রাখে ঢাকা পৌরসভা। এখনো এ এলাকাটি ঢাকা সিটি করপোরেশনে প্রসন্ন পোদ্দার হিসেবে নথিভুক্ত থাকলেও স্থানীয়ভাবে তাঁতীবাজার হিসেবেই পরিচিত।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, শিলালিপি নেই। এরপর আরো ক'দফা সরেজমিন অনুসন্ধানে যাওয়ার পর ২০১১ সালে আয়তাকার কালো পাথরে ফারসি হরফ উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি দেখায় তারা।

এর কিছু দিন পর আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য মসজিদটিতে গেলে সাদা পাথরের একটি শিলালিপি দেখানো হয়। এই সাদা পাথরের শিলালিপিটিকেই মসজিদের আসল শিলালিপি বলে দাবি করে মসজিদ কমিটি। আগে দেখানো কালো পাথরের শিলালিপির কথা বেমালুম অস্বীকার করে তারা। এরপর অনেক চেষ্টা তদবির করেও কালো পাথরের শিলালিপিটির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পোস্তাগোলা এলাকার আরসিম গেট মসজিদ, চকবাজার এলাকার ছোট কাটরা বড় মসজিদ, বংশাল এলাকায় সুবেদারঘাট মসজিদ, হাজারীবাগের বোরহানপুর মসজিদসহ আরো কিছু মসজিদে শিলালিপি ছিল বলে অনুসন্ধানকালে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার সকল প্রাচীন মসজিদে শিলালিপি ছিল। মসজিদ নির্মাণ করে শিলালিপি স্থাপন করা ছিল তৎকালীন রেওয়াজ। শিলালিপি ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাজারেও।

কমিটির ধারণা, আরবী, ফার্সি ও উর্দু শিলালিপির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারিয়েছে মাজারের শিলালিপি। ঢাকার প্রায় সকল প্রাচীন মসজিদের পাশে কবরস্থান ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কবরে সাধারণত শিলালিপি থাকতো। কিন্তু এখন কবরের প্রাচীন শিলালিপি নেই। ঢাকার প্রাচীন মসজিদের পাশের অধিকাংশ উন্মুক্ত স্থান দখল হয়ে গেছে। কবরের ওপরে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আগুরি বেগম, বব্বু খানম, কলিমউদ্দিন প্রমুখের মাজারের শিলালিপিসহ আরো কিছু শিলালিপি বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে রক্ষিত আছে।

ঢাকার মন্দির-আখড়া-মঠ এবং শিলালিপি

ঢাকার স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে মন্দির, মঠ ও আখড়া। প্রাচীনকাল থেকেই ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিভিন্ন মন্দির, মঠ ও আখড়া। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে ঢাকার একটি মাত্র মন্দিরের শিলালিপির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়- লক্ষণ সেনের

আমলের সংস্কৃত ভাষার চণ্ডী দেবীর শিলালিপি। এছাড়া আর কোন মন্দির, আখড়ার শিলালিপির উল্লেখ গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

জেমস ওয়াইজ তার গ্রন্থে ঢাকার বিভিন্ন মন্দির ও আখড়ার কথা উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত। কিন্তু গত অর্ধ শতাব্দি ধরে প্রকাশিত গ্রন্থে ঢাকার মন্দির ও আখড়া নিয়ে লেখা হয়েছে খুবই কম। পাওয়া যায় না ঢাকার মন্দির ও আখড়াসমূহের কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা। স্থাপত্য জরিপকালে ঢাকায় ৭৮টি প্রাচীন মন্দির, মঠ ও আখড়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে মুঘল আমল ও কোম্পানি আমলের প্রচুর মন্দির ও আখড়া রয়েছে। তবে মুঘল ও কোম্পানি আমলের কোন মন্দির-আখড়া-মঠের শিলালিপির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ঢাকায় জরিপ চলাকালে যেসব মন্দির-মঠের শিলালিপি পাওয়া গেছে, সবই ব্রিটিশ আমলের এবং অধিকাংশের ভাষা বাংলা।

ঢাকার প্রাচীন মঠ, মন্দির ও আখড়ায় প্রাচীন শিলালিপি বর্তমানে না থাকার কারণ জানার চেষ্টা করেছে কমিটি। এ জন্য বিভিন্ন মন্দিরের কর্মকর্তা, পূজারী, হিন্দু সমাজের সংগঠক, গবেষকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কমিটি কথা বলেছে। কিন্তু এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

মন্দিরের শিলালিপি বিষয়ে অনুসন্ধানকালে ৩টি মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের মন্দিরে শিলালিপি ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নিখোঁজ হয়েছে। মন্দির তিনটি হচ্ছে গোঁসাইবাড়ি এলাকার রাধা গোবিন্দ মন্দির, উত্তর মৈশুণ্ডি এলাকার প্রাণগোপাল জিউ মন্দির ও নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও আখড়া। অন্যদিকে গবেষক হাশেম সূফী জানিয়েছেন, ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে দু'টি শিলালিপি ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরেও শিলালিপি দু'টি দেখা গেছে।

সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর মৈশুণ্ডির ১৩ ডা. রাধাশ্যাম সাহা স্ট্রিটের প্রাণগোপাল জিউ বিগ্রহ মন্দিরের শিলালিপি ভবনের সামনে দেয়ালে স্থাপন করা ছিল। মন্দির পরিচালনা কমিটির সদস্য দীপক শর্মা জানান, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মন্দিরে লুটপাট হয়। মন্দির থেকে পাথরের মূর্তি নিয়ে যায়। খুলে নিয়ে মন্দিরের শিলালিপি। শিলালিপিতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সাল এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখা ছিল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ফরিদাবাদের গোঁসাইবাড়ি এলাকার রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দিরের শিলালিপি নিখোঁজ হয়। গেন্ডারিয়া থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নবীন চন্দ্র গোস্বামী রোডে রাধা গোবিন্দ্র জিউ মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর নবীন চন্দ্র গোস্বামীর নামে সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে। আর মন্দিরের নামে এলাকাটি পরিচিত গোঁসাইবাড়ি নামে।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি বাদল সরকার জানান, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মন্দিরের প্রবেশপথের ওপরে স্থাপন করা ছিল শিলালিপি। বাদল সরকার আরো জানান, ১৯৭১ সালে মন্দিরটি দখল করে নিয়েছিল। তখন শিলালিপি খুলে নেয়া হয়। এরপর আর শিলালিপি পাওয়া যায়নি।

নবাবপুর এলাকার একটি আখড়া থেকে শিলালিপি নিখোঁজের কথা জানানো হয়েছে। আখড়াটির নাম লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও আখড়া, অবস্থান সূত্রাপুর থানায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৩১, ৩১/এ, ৩১/বি নবাবপুর রোডে। জরিপ চলাকালে বিভিন্ন সময়ে কথা হয় মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারা জানান, মন্দিরের প্রবেশপথের ওপর স্থাপন করা ছিল শিলালিপি। কোতোয়ালি থানার পাটুয়াটুলী এলাকায় ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের অবস্থান। হাশেম সূফী কমিটিকে জানান, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন পিয়ারীমোহন দাস, যার নামে প্যারিদাস রোড হয়েছে। তিনি তার বাবা রাজ চন্দ্র দাসের নামে ব্রাহ্ম সমাজের মূল ভবনের পেছনে একটি আবাসিক ভবন তৈরি করে দিয়েছিলেন। আবাসিক ভবনের কোণায় একটি শিলালিপি ছিল। শিলালিপি ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মূল ভবনেও। শিলালিপি দু'টি সাদা মার্বেল পাথরে লেখা এবং ভাষা ছিল ইংরেজি। শিলালিপি দু'টি কলকাতায় তৈরি ছিল এবং নিচে কোম্পানির নাম লেখা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরেও ব্রাহ্ম সমাজের শিলালিপিগুলো স্থাপন করা অবস্থায় দেখা গেছে।

ঢাকায় মাত্র ৪টি মন্দির থেকে শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার কথা জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মন্দিরে যোগাযোগ করার পরও আর কোন মন্দির ও আখড়া থেকে শিলালিপি নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অথচ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ঢাকায়ও প্রাচীন মন্দির ও আখড়ায় শিলালিপি থাকার কথা। কমিটি মনে করে, এ বিষয়ে আরো ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ঢাকার শিলালিপি চর্চা ও দু'টি প্রকাশনা

ঢাকার শিলালিপির প্রথম গ্রন্থনা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। জেমস ওয়াইজের খুঁজে পাওয়া নাসুওয়ালা গলি মসজিদের আরবি ভাষার শিলালিপি ঐ বছর প্রথম ছাপেন ব্লকমান (জেএএসবি, ভল্যুম-৪১)। এরপর ৭৫ বছরে বিগত শতাব্দির সৈয়দ আওলাদ হোসেন, রহমান আলী তায়েশ, হাকিম হাবিবুর রহমান, নাজির হোসেন প্রমুখ গবেষক ঢাকার ৩৫টি শিলালিপির সন্ধান দেন।

বিগত শতাব্দির সত্তর ও আশির দশকে নাজির হোসেনের 'কিংবদন্তির ঢাকা' এবং মোঃ আবদুর রশিদের লেখা 'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা' বইতে বেশ কিছু শিলালিপির কথা উল্লেখ করা হয়। বিগত শতাব্দির আশির দশকের পর গত ৩০ বছর ঢাকায় নতুন কোন শিলালিপির সন্ধান পাওয়ার কথা জানা যায় না।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এনামুল হকের ফুলস্কেপ সাইজে ৪০০ পৃষ্ঠার 'ঢাকা এলিয়াস জাহাঙ্গীরনগর ৪০০ ইয়ার্স' শীর্ষক গ্রন্থ। এতে তিনি ঢাকার বেশ কয়েকটি শিলালিপির কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে তিনি একটিও নতুন শিলালিপির কথা উল্লেখ করেননি।

এনামুল হক সম্পাদিত 'জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট'-এর প্রথম চার সংখ্যায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের নতুন শিলালিপি নিয়ে প্রবন্ধ থাকলেও ঢাকার নতুন কোন শিলালিপির কথা সেখানে নেই। কমিটি ঢাকায় জরিপ চালিয়ে নতুন শিলালিপির সন্ধান লাভের পর আলোকচিত্র গ্রহণ, পাঠোদ্ধার ও অনুবাদের পর সম্পাদনা কাজ শুরু করলে ২০১০ সালে একটি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে দাবি করা হয়, ঢাকার নতুন শিলালিপির সন্ধান অনেক আগে তারা পেয়েছিল।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির প্রথম প্রতিবেদন 'ঢাকার শিলালিপি'তে এ বিষয়ে বলা হয়: *"লেখক পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক। ইংরেজি বইটির সম্পাদক জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ড. এনামুল হক। ঢাকার বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রকাশিত 'হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল আসপেক্টস অব দ্য ইসলামিক ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল: এ রিফ্লেকটিভ স্টাডি অব সাম নিউ এপিগ্রাফিক ডিসকভারিস' শীর্ষক ইংরেজি ভাষার বইটির লেখক পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক। প্রকাশকাল লেখা আছে নভেম্বর ২০০৯। বইটিতে ২০০৮ সালে কমিটির খুঁজে পাওয়া ১০টি শিলালিপি প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে গ্রন্থিত সকল শিলালিপির নির্দিষ্ট ঠিকানা ও বিবরণ থাকলেও নতুন কোনো শিলালিপিরই দেওয়া হয়নি বিবরণ। বলা হয়নি নির্দিষ্ট ঠিকানাও। ঠিকানা হিসেবে কেবল 'পুরনো ঢাকা' উল্লেখ করায় সেগুলো কোথায় কিভাবে আছে তা বোঝারও সুযোগ নেই। আবার দু'একটি মসজিদের ঠিকানা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মসজিদের প্রকৃত অবস্থানের ধারে-কাছে যেতে পারেননি লেখক। যেমন মিটফোর্ড হাসপাতাল ও চকবাজারের মধ্যবর্তী নলগোলা শাহী মসজিদকে তিনি উল্লেখ করেছেন নবাবগঞ্জের রথখোলার স্থাপনা হিসেবে। আবার মাজার ঘরের প্রবেশ পথের উপরের দেওয়ালে গাঁথা বাড্ডানগর মুন্সীবাড়ীর মসজিদের শিলালিপিকে তিনি দেখেছেন মসজিদের গায়ে।*

শিলাখণ্ডের পরিমাপ বলতে গিয়ে সব স্থানেই 'অজানা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন লেখক। এমনকি গ্রন্থিত শিলালিপি কোন রঙের পাথরে তাও বলতে পারেননি পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। যেমন- কাজী মোহাম্মদ শরীফ মসজিদের শিলালিপি কোন পাথরের তা বলতে গিয়ে তিনি 'সম্ভবত কালো পাথর' কথাটি ব্যবহার করেছেন। স্থাপনার নামও লেখক যথার্থভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। কাজী শরীফ মসজিদকে ডিসি রায় মসজিদ ও হাজী বেগ মসজিদকে ঢাকেশ্বরী রোড মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

শিলালিপি বিষয়ে গবেষণার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা ইউনির্ভাসিটির ফ্যাকাল্টি অব হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ও পাকিস্তানের হায়ার এডুকেশন কমিশন এবং ইরান হেরিটেজ ফাউন্ডেশন লন্ডন থেকে তহবিল পেয়েছেন বলে লেখক ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তবে কবে জরিপ চালিয়েছেন, কিভাবে চালিয়েছেন বা কোন কোন জায়গায় নতুন শিলালিপি পেয়েছেন তা উল্লেখ করেননি।

বইটিতে আর সব শিলালিপির আলোকচিত্র ছাপা হলেও নতুন শিলালিপিগুলোর ফটোকপি ছাপা হয়েছে। গ্রন্থে আলোকচিত্রের ফটোকপি ছাপানোর ঘটনা বিরল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আমরা শিলালিপির আলোকচিত্রের ফটোকপি বিতরণ করেছি।

'হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল আসপেক্টস অব দ্য ইসলামিক ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল: এ রিফ্লেকটিভ স্টাডি অব সাম নিউ এপিগ্রাফিক ডিসকভারিস' শীর্ষক

বইতে সব ক'টি নতুন শিলালিপির রেফারেন্স হিসেবে সিরিয়া থেকে আরবি ভাষায় প্রকাশিত একই লেখকের 'রিহলা মা'আল নাকুশ আল ইসলামিক ফি বানগাল' বইটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি বইটিতেও অন্য সকল শিলালিপির আলোকচিত্র প্রকাশ হলেও নতুন শিলালিপির ফটোকপি ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থেকে আরবি গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দেখা গেছে, তাড়াহুড়ো করে ছাপানোর কারণেই কি না কে জানে বইয়ের লেখকের নামের বানান ভুল ছাপা হয়েছে।"

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির উদ্যোগে ২০১১ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে গুরুদোয়ারা সংলগ্ন চত্বরে 'ঢাকার শিলালিপি : প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আমল' শীর্ষক অনুবাদসহ আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত হন পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক। মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক তখন প্রদর্শনীস্থল থেকে শিলালিপির আলোকচিত্র তুলে নিয়ে যান।

প্রদর্শনীস্থলে কমিটির পক্ষ থেকে ড. ইউসুফ সিদ্দিককে বলা হয়, আপনি কোনও ধরনের জরিপ কাজ না করে দাবি করছেন, নতুন শিলালিপির সন্ধান আপনি পেয়েছেন। আপনার গ্রন্থে উল্লিখিত শিলালিপি কোন মসজিদে আছে, তা আপনি জানেন না। জানলে চলুন, সেই মসজিদগুলোতে যাই।

এসময় ইউসুফ সিদ্দিক মাঠকর্মীদের উদ্দেশ করে বলেন, 'বেশ আগে জরিপ করেছি। এখন স্থান মনে নেই।' গ্রন্থে ঠিকানা কেন নেই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমার বক্তব্য আমি লিখে রেখে যাব।'

এরপর প্রদর্শনীর মন্তব্য খাতায় ড. মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক লিখেন তার বক্তব্য। এতে তিনি উল্লেখ করেন ঃ *আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে আমি আরবী ও ফরসি শিলালিপি নিয়ে কিছু কাজ করেছিলাম সুদূর মক্কায় বসে, এবং সেখানে বসে কিছু মূল এবং কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে সে প্রবন্ধগুলো আরবীতে প্রকাশ করেছিলাম ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ এর মধ্যে। এর কিছুকাল পরে সেটি বই আকারে প্রকাশ পেয়েছিল প্রথমে আরবী এবং পরে ইংরেজিতে, যার ছবিগুলো ছিল শিলালিপিগুলোর ছাপ বা রুবিংস এর উপর ভিত্তি করে।*

২০১০ সালে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের বনানীর অফিস থেকে এনামুল হক সম্পাদিত গ্রন্থটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। কেন্দ্রের শিলালিপি বিষয়ক জার্নালগুলোও তখন সংগ্রহ করা হয়। তখন মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রবন্ধটির কথা জানা যায়নি। ঢাকা ও শিলালিপি বিষয়ে গবেষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে কমিটি, সংগ্রহ করে যাচ্ছে ঢাকা ও শিলালিপি বিষয়ক বই ও প্রবন্ধ। কিন্তু ২০১০ সাল পর্যন্ত কেউ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেননি। ২০১১ সালে কমিটির হাতে আসে এনামুল হক সম্পাদিত জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট-এ প্রকাশিত আবদুল কাদিরের 'ক্যাটাগোরাইজেশন অব মস্কস ইন বাংলাদেশ ইনটু মস্কস ফর জু'মাহ প্রেয়ার (আল-মাসজিদ আল জামি) অ্যান্ড মস্কস ফর পানচ ওয়াকত নামাজ (মাসজিদ লি সালাত আল খামস) অ্যান্ড আদারস' শীর্ষক প্রবন্ধটি।

'ঢাকার শিলালিপি : প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আমল' শীর্ষক অনুবাদসহ আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে এসেছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক মুহাম্মাদ আবদুল কাদির। প্রদর্শনীতে এসে তিনি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তার বাসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ করেন।

মুগদাপাড়ায় তার বাসায় যাওয়ার পর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ড. এনামুল হকের সম্পাদনায় 'জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট'-এ তার একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি আগা মসীহ লেনসহ কয়েকটি নতুন শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেন।

এনামুল হক সম্পাদিত গ্রন্থে বিভিন্ন শিলালিপির আলোকচিত্র, পাঠ ও পাঠের অনুবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রবন্ধে শিলালিপির কোন আলোকচিত্র বা পাঠ দেয়া হয়নি। দেয়া হয়নি শিলালিপিসমূহের ঠিকানা বা কোন ধরণের বিবরণ। আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু শিলালিপির নাম ও বছর লেখা হয়েছে। মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রবন্ধে উল্লিখিত লক্ষ্মীবাজার মসজিদ, খাজে দেওয়ান লেন শাহী মসজিদ ও রোকনপুর মসজিদের শিলালিপির আলোকচিত্র কমিটির প্রথম প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। আগা মসীহ লেন মসজিদের শিলালিপি নিখোঁজ।

জার্নাল অব বেঙ্গল আর্টের ৮ম খণ্ডে মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছে। এতে প্রকাশকাল ২০০৩ বলে লেখা আছে। তবে অনুসন্ধানকালে জার্নালটির প্রকাশকালের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা

দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা হয়েছে, মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিকের গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পর মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

মুহাম্মাদ আবদুল কাদির গত ৪০ বছর ধরে শিলালিপি বিষয়ে লেখালেখি করছেন। আবিষ্কার করেছেন বেশকিছু শিলালিপি। কিন্তু তিনি ২০১১ সালের আগে কখনও ঢাকায় নতুন শিলালিপি আবিষ্কারের দাবি করেননি।

মুহাম্মাদ ইউসুফ সিদ্দিকের গ্রন্থে নতুন শিলালিপির পাশাপাশি ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিলালিপির আলোকচিত্র ও পাঠ দিয়েছেন। মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের আবিষ্কার করা শিলালিপির পাঠ রয়েছে ইউসুফ সিদ্দিকের গ্রন্থে। রয়েছে আবদুল কাদিরের নাম ও প্রবন্ধের নাম। খাজে দেওয়ান লেন মসজিদ, বড় কাটরা ছোট মসজিদ ও নীমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদের শিলালিপির নাম রয়েছে কথিত ২০০৩ সালে প্রকাশিত আবদুল কাদিরের প্রবন্ধে। কিন্তু ইউসুফ সিদ্দিকের ২০০৯ সালে প্রকাশিত বইয়ে উল্লিখিত ৩টি শিলালিপি ছাপা হয়েছে নতুন শিলালিপি হিসেবে। ইউসুফ সিদ্দিকের আবিষ্কার হিসেবে। রেফারেন্স হিসেবে আবদুল কাদিরের নাম ছাপা হয়নি।

শুধু মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক নয়, অন্য কোন লেখক-গবেষকের লেখায়ও আবদুল কাদিরের প্রবন্ধটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ নতুন শিলালিপির নাম থাকলে পরবর্তী গবেষকদের লেখায় তা আসার কথা। কমিটির ধারণা, ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি শিলালিপি জরিপের মাধ্যমে যে সকল নতুন শিলালিপির সন্ধান পেয়েছে, তার কৃতিত্ব নিজেদের করে নিতে পিছনের তারিখ দিয়ে জার্নালের সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরণের তৎপরতা এনামুল হক ভবিষ্যতে আরো চালাতে পারেন বলে কমিটির আশংকা।

মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে কমিটির মাঠকর্মীরা জানিয়েছিল, তার প্রবন্ধে উল্লিখিত শিলালিপি এখন নিখোঁজ। নিখোঁজ শিলালিপিসহ অন্য নতুন শিলালিপিগুলো তিনি কবে, কোথায়, কী অবস্থায় দেখেছেন-এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে অনুরোধ করেন মাঠকর্মীরা।

তখন ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির কমিটির মাঠকর্মীদের জানান, বিগত শতাব্দির আশির দশকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে ছাপের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন শিলালিপির অনুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল। তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করা নতুন শিলালিপিগুলো সেই জরিপের ফলাফল থেকে নিয়েছেন।

পরবর্তীতে মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অফিসে দেখা হয়। সেখানে তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ছাপের মাধ্যমে শিলালিপির অনুলিপি সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ছাপের মাধ্যমে প্রাচীন মসজিদের শিলালিপির পাঠ সংগ্রহের উদ্যোগের বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় কমিটি। প্রাচীন মসজিদসমূহ থেকে জানা গেছে, আশির দশকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে ছাপের মাধ্যমে শিলালিপির অনুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল। ড. মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক ঢাকায় মসজিদ ও মাজারের শিলালিপি বিষয়ে জরিপ করেছিলেন কিনা, ছাপের মাধ্যমে এ অনুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন কিনা- সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানকালে আরো জানা গেছে, ছাপের মাধ্যমে প্রাচীন মসজিদ ও মাজারের সংগৃহীত শিলালিপির অনুলিপিগুলো বর্তমানে নিখোঁজ। মহাপরিচালকসহ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কমিটির পক্ষ থেকে বার বার যোগাযোগ করা হয়। প্রথমে অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ জানান, এ ধরণের কোন কাগজপত্র আছে কিনা তারা খুঁজে দেখবেন। পরবর্তীকালে তারা জানান, শিলালিপির অনুলিপি পাওয়া যাচ্ছে না। কতগুলো শিলালিপির ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কবে থেকে নিখোঁজ রয়েছে, সে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, আশির দশকে তারা চাকুরিতে ছিলেন না, তাই এ বিষয়ে তারা কিছু বলতে পারছেন না।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির উদ্যোগে ঢাকার প্রাচীন শিলালিপিসমূহের সন্ধান পাওয়ার পর এনামুল হকের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও জার্নালের প্রবন্ধে জরিপ না করে হঠাৎ করে নতুন শিলালিপি আবিষ্কারের দাবির ঘটনা এবং সরকারি উদ্যোগে সংগৃহীত শিলালিপির অনুলিপি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। ঢাকার শিলালিপিসমূহ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার সাথে শিলালিপির অনুলিপিসমূহ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কযুক্ত কিনা-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বার্থেই তা জানা প্রয়োজন।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি ঢাকার শিলালিপি নিখোঁজ হওয়া, শিলালিপির অনুলিপি নিখোঁজ হওয়া এবং এনামুল হকের প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন শিলালিপি আবিষ্কারের দাবিসহ তার শিলালিপি বিষয়ক তৎপরতা বিষয়ে তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

পরিশিষ্ট-ক

নিখোঁজ শিলালিপির অপ্রকাশিত পাঠ

পাঠ সংগ্রহ : মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্‌পুরী

ছোট কাটরা ছোট মসজিদের শিলালিপি

بعہد محمد شاہ دادگر

مزین شد این بیت طاعات بیا

بگوشم خرد گفت تاریخ او

جزایش بخیر است تاریخ او - سنہ ۱۱۳۳ هجری

বেগমবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি

بسم الله الرحمن الرحيم

لااله الا الله محمد رسول الله

امان الله شدبانی مسجد

خداوندانگہ دار از زوالش

ہدایت گفت بہریادگار

عبادت خانہ شد تاریخ سالش سنہ۱۱۳۳

খাজে দেওয়ান লেন দোতলা মসজিদের শিলালিপি

ب

بـعـهـد مـحـمـد شـا ه نـيـک ر ا ى

چـون جـا ن بـى بـى کـر د مـسـجد بـنـا ى

بـو د شـو هـرش يـا ر مـحـمـد يـقـيـن

بـو د سـر بـر ا ه کـا ر جـعـفـر بـبـيـن

بـشـو ا ل شـا نـز د ه بـجـلـوس

ز هـجـر ت هـز ا ر و يـکـصد و چـل سـا لـى (১১৪০)

কলতাবাজার গাড়িখানা মসজিদের শিলালিপি

گفت هاتف ساخته صادق بن رضا

التحييه برشاه عجم وعرب

چوں تاريخش پرسيدم که چيست

قيل نيل عقل وا سجد واقترب سنه ۱۲۱۳ هجرى۔

আলুরবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি

يافتاح

مبارک مسجد عالی بنایش

کہ دروے نورحق گردیده لامع

سوال کردم از سال بنابش

خرد گفتہ مکان فیض مسجد جامع

بانی مسجد جان محمد ولد شیخ محمد سنہ ۱۲۲۱ هجری

সিংটোলা মসজিদের শিলালিপি

بسم الله الرحمن الرحيم۔

لاالہ الا الله محمد رسول الله

چوں دخیتے ثنا الہ بی ضامنہ

کہ زوجہ غلام محمد چو مہ

بناکرد کہ ایں اہل دین حق سراح

پسندیده شد درگہ کبریا

چوسائل بگفت سال تاریخ آں

بزارو دوصد وسی پنجم عیاں ع۱۲۳۵ ہجری

পাঁচকুড়ি শাহ-এর ওয়াকফের শিলালিপি

بسم الله الرحمن الرحیم۔

پانچ کوری شاہ یک کٹھوری مع درگہ پنجتن

پاک وقف نمودہ درسن ١٢٥١ ہجری۔

খাকী শাহ-এর মসজিদের শিলালিপি

کی بنامسجدیہ خاکی شہ نے

دیکھکر ایمان نے یہ مصرع لکھی

جنکی قائم حشر تک بنیادہے

خانہ دین وروشن آبادی۔

خاکی شاہ حنفی المذہب سنہ ١٣٠٠ هجری۔

পরিশিষ্ট-খ

নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্থানের নিখোঁজ শিলালিপির অপ্রকাশিত পাঠ
পাঠ সংগ্রহ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী নকী

রবার্ট ম্যাক্স ওয়েলের সমাধির শিলালিপি

SACRED

to the Memory

of

ROBERT MAXWELL

Late captain & commandant

of the 35th Battalion of Native Infantry

who departed this life

the 28th October 1792

Age 40 years and 3 months

R. Gray & Urquhart Sep'

ইরেনস...-এর সমাধির শিলালিপি

SEC...............

............MORY OF ....

ERANC'..S..LAWE

Who departed this life

on the 22nd of September 1772

AGED X L V 11 YEAR

Man in whom many and rules

were to be found

Humane and Charitable to a Degree

Rich in the Treasures of a feeling Mind

He knew no Good but that of all Mankind

no Selfish Aim and mlp..ins just Design

But holy Love and Charity Divine

While in the Wrangling Songs of Strife

megr....the Example of a blaneles Life

cal................

গ্লারেন্স হুগয়েরে-এর সমাধির শিলালিপি

IN LOVING MEMORY OF

OUR DARLING SON

GLARENCE HOOGEWERE

DIED 26th FEBRUARY 1912

AGED 10 MONTHS

A LITTLE TIME ON EARTH HE SPENT

TILL GOD FOR HIM, HIS ANGEL SENT

রবার্ট ডসেট ইস্ক-এর শিলালিপি

TO PERRPETUATE THE MEMORY OF

PTETY, CHARITY AND INTEGRITY

PRACTICED DURING A LONG AND VARIEGATE TIME

THIS MONUMENT IS ERECTED

BY NUMOROUS FRIENDS

BOTH EUROPEAN, AND NATIVE

OF THE...HE

ROBERT DOUGETT, ESQ

WHO WAS BLESSED WITH A HAPPY DEATH

ON OCTOBER 19TH 1815

AGED ..9 YEAR.

বনেট রোচে-এর সমাধির শিলালিপি

REV. BONNET ROCHE. CSE

Born 6-1-1832

Died 12-8-1897

R.I.P

মাইকেল মাঙগান-এর শিলালিপি

REV. MICHAEL MANGAN c.s.c

Born 28-4-1897

Died 24-11-1943

R.I.P

সরাফিন অ্যান লেফেউভপে নি ফিলিপে-এর শিলালিপি

A. T...LE..TE OF AFFECTION
N.- HER BEREATED HUSBAND
TO THE LOVING MEMORY OF
SERAPHINE ANN LEFEUVPE
NEE PHILIPPE
WHO AFTER A SOMEWHAT
SUFFERING ILLNESS FELL
ASLEEP IN CHRIST
ON THE 26th MAY 1872
AGED 35 YRS 11 MOS.13. D...
REQU I ESQ IT IN PACES
THOMAS AND CO.
CALCUTTA

এডমন্ড লেকোলিয়ের-এর শিলালিপি

SACRED
TO THE MEMORY OF
EDMOND LECOLIER
WHO DEPARTED THIS LIFE
ON THE 10th OF JUNE 1837
IN THE 65th YEAR
OF HIS AGE
DEEPLY REGRATTED
BY ALL WHO KNEW HIM
REQUIS... IN PACE

সিস্টার এমিলি-এর শিলালিপি

SISTER
M.ST. AMELIE
DIED 25.4.1937

উইলিয়াম টেরেন্স-এর শিলালিপি

In Loving Memory
of
William Terence Hossladt
Born 9th Feb 1919
Died 4th Sept 1940
R.I.P.

সিস্টার আলফনসে-এর শিলালিপি

SISTER
M. ST. ALFHONSE
R. N.D. M
DIED. 20 .4 1926

সিস্টার ভিক্টরি-এর শিলালিপি

SISTER
M.ST. VICTOIRE
R.N.D.M
DIED 21.4. 1926

সিস্টার ইউফরোজিনে-এর শিলালিপি

SISTER
M .S T. EUPHROSINE
R.N.D.M.
DIED 9.8.1922

জেমস ম্যাকলাপেন টোসা-এর শিলালিপি

IN LOVING MEMORY OF
JAMES MACLAPEN TOSA
WHO DIED AT NARAYANGANJ
22ND MARCH 1929
AGED 57 YEARS.
FORMERLY OF BROUGHTY FERRY
SCOTLAND
L.BW LLYN & Co. CAL

পাট ব্যবসায়ী উইলিয়াম হিউম ব্যাংকস-এর শিলালিপি

WILLIAM HUME BANKS
JUTE MARCHENT
BORN DONDEE SCOTLAND, 9TH FEBRUARY 1876
DIED POSTOGOLLA , DACCA , 4TH AUGUST 1913

পরিশিষ্ট-গ

ঢাকার এশীয় ভাষার শিলালিপি

আরবী, ফার্সি ও উর্দু

বিনতবিবির মসঁজিদের শিলালিপি, ফারসি, ৮৬১ হি:/১৪৫৬-৫৭ খ্রি:
নাসুওয়ালা গলির মসঁজিদের শিলালিপি, আরবী, ৮৬৩ হি:১৪৫৮-৫৯ খ্রি:
শাহ আলীর মাজারের প্রথম শিলালিপি, আরবী, ৮৮৫ হি:/১৪৮০-৮১ খ্রি:
ইসলামপুর মসজিদের শিলালিপি, আরবী, ৯১০ হি:/১৫০৪-০৫
ধানমণ্ডি ঈদগাহ - এর শিলালিপি, ফারসি, ১০৫০হি:/১৬৪০-৪১ খ্রি:
হোসনী দালান-এর শিলালিপি, ফারসি, ১০৫২ হি:/১৬৪২-৪৩ খ্রি:
কাজী মোহাম্মদ শরীফ মসঁজিদের প্রথম শিলালিপি, ফারসি, ১০৫২ হি:/১৬৪২-৪৩
বড় কাটরার শিলালিপিসমূহ, ফারসি, ১০৫৩ হি:/১৬৪৩-৪৪ খ্রি:
কাজী মোহাম্মদ শরীফ মসঁজিদের দ্বিতীয় শিলালিপি, ফারসি, ১০৫৪ হি:/১৬৪৪-৪৫ খ্রি:
বড় কাটরা ওয়াকফ, ফারসি, ১০৫৫ হি:/১৬৪৫-৪৬ খ্রি:
চুড়িহাট্টা মসঁজিদের শিলালিপি, আরবী ও ফারসি, ১০৬০ হি:/১৬৫০ খ্রি
শায়েস্ত খানের মসঁজিদের শিলালিপি, আরবী, ১০৭--হি:/১৬৬--- খ্রি:
ছোট ভাট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৮২ হি:/১৬৭১-৭২ খ্রি:
চকবাজার মসঁজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৮৬ হিজরি/১৬৭৫-৭৬ খ্রি.
খাজা আম্বরের মসঁজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৮৮ হিজরি/১৬৭৭-৭৮ খ্রি.
খাজা শাহবাজের মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৮৯ হিজরি/১৬৭৮-৭৯ খ্রি.)
বাস্তানগর মুন্সীবাড়ি জামে মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৯২ হিজরি/১৬৮১ -৮২ খ্রি.
আমলীগোলা ছোট্ট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৯৪ হিজরি/ ১৬৮৩ খ্রি.
লালবাগ দূর্গ মসজিদের শিলালিপিদ্বয়, ফারসি, ১০৯৫ হিজরি/১৬৮৩-৮৪ খ্রি.
পরিবিবির মাজারে প্রাপ্ত শিলালিপি, ফারসি, ১০৯৫ হিজরি/১৬৮৩-৮৪ খ্রি.
মকিমবাজার মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৯৭ হিজরি/১৬৮৫-৮৬ খ্রি.
বড়ভাট মসঁজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৯৮ হিজরি/১৬৮৬-৮৭ খ্রি.
কোর্ট হাউজ স্ট্রীট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১০৯৮ হিজরি/১৬৮৬-৮৭ খ্রি.
নলগোলা শাহী মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১০১ হিজরি/১৬৮৯-৯০ খ্রি.
হাজী বেগ মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১০৩ হিজরি/ ১৬৯১ -৯২ খ্রি.
শাহ শকর মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১০৪ হিজরি/১৬৯২-৯৩ খ্রি.
নিমতলী ছাতিওয়ালা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১০৪ হিজরি/১৬৯২-৯৩ খ্রি.
জিন্দাবাহার জামে মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১০৫ হিজরি/ ১৬৯৩-৯৪ খ্রি
আরমানিটোলা সবুজ মসজিদের শিলালিপি, ১১০৮ হিজরি, ১৬৯৬-৯৭ হিজরি
প্যারিদাশ রোড মসজিদের শিলালিপি, ফারসি/আরবি ১১০৯ হি:/১৬৯৭-৯৮
ভাগলপুর মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১১০ হিজরি/১৬৯৮-৯৯ খ্রি.
রায়সাহেব বাজার পুলের মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১১১ হিজরি/১৬৯৯ -০০ খ্রি.

খাজা দেওয়ান লেন শাহী মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১১৬ হিজরি/১৭০৪-০৫ খ্রি.
খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদের প্রথম শিলালিপি, ফারসি, ১১১৬ হিজরি/১৭০৪-০৫ খ্রি.
খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদের দ্বিতীয় শিলালিপি, ফারসি, ১১১৬ হিজরি/১৭০৪-০৫ খ্রি.
বিবি সালেহা মরিয়মের মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১১৮ হিজরি/১৭০৬-০৭ খ্রি.
আলমগঞ্জ মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১১৯ হিজরি/১৭০৭ -০৮ খ্রি.
পিলখানা মসজিদের প্রথম শিলালিপি, ফারসি, ১১২০ হিজরি/১৭০৮-০৯ খ্রি.
বড় কাটরা ছোট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১২৫ হিজরি/১৭১৩-১৪ খ্রি.
কেন্দ্রীয় কারাগার বাগানবাড়ি জামে মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১২৬ হিজরি/১৭১৪-১৫ খ্রি.
আর্মেনিয়াম স্ট্রিট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১২৭ হিজরি/১৭১৫ খ্রিঃ
লালবাগ শাহী মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১২৯ হিজরি, ১৭১৬-১৭ খ্রিঃ
মীর ফাইয়াযের সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১১৩১ হিজরি/১৭১৮-১৯ খ্রি.
ছোট কাটরা ছোট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৩৩ হিজরি, ১৭২০-২১ খ্রিঃ
বেগমবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৩৩ হিজরি, ১৭২০-২১ খ্রিঃ
আগা সাদেক রোড মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৩৩ হিজরি/১৭২০-২১ খ্রি,
গোর ই শহীদ মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৩৬ হিজরি/১৭২৩-২৪ খ্রি.
নবাবগঞ্জ মসজিদের শিলালিপি, আরবী, ১১৩৬ হিজরি/১৭২৩ -২৪ খ্রি.
খাজে দেওয়ার লেন দোতলা মসজিদের শিলালিপি ১৬ শাওয়াল ১১৪০ হিজরি
চকের শিলালিপি, ফারসি, ১১৪১ হিজরি/১৭২৮-২৯ খ্রি.
বংকু ভাট্টি মসজিদের শিলালিপি, ১১৪৩ হিজরি/১৭৩০-৩১খ্রিঃ
শাহ আবদুর রহিমের মাযারের শিলালিপি, ফারসি, ১১৫৮ হিজরি, ১৭৪৫-৪৬ খ্রিঃ
আজিমপুর মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৬০ হিজরি/১৭৪৭-৪৮ খ্রি.
গজমহল বড় মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৬১ হিজরি/১৭৪৮-৪৯ খ্রি.
চকবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৬২ হিজরি/১৭৪৮-৪৯ খ্রিঃ
ভাটিখানা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১১৭৭ হিজরি/১৭৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দ
শাহ নুরী-এর মাজারের শিলালিপি (১১৮৮ হিজরি/ ১৭৭৪-৭৫ খ্রি.
আজিমপুর দায়রা শরীফের প্রথম শিলালিপি, ১১৯০-৯৩ হিজরি
সাত রওজা মসজিদের শিলালিপি, ১১৯৮ হিজরি/১৭৭৩-৭৪ খ্রিঃ
পিলখানা মসজিদের দ্বিতীয় শিলালিপি, ফারসি, ১২০২ হিজরি/১৭৮৭-৮৮ খ্রি.
রোকনপুর মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২০৪ হিজরি/১৭৮৯-৯০ খ্রি.
পল্টন ময়দান মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২১২ হিজরি/১৭৯৭-৯৮ খ্রি.
নন্দলাল দত্ত লেন মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২১২ হিজরি/১৭৯৭-৯৮ খ্রি.
কারিখানা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২১৩ হিজরি, ১৭৯৮-৯৯ খ্রিঃ
দায়েম শাহ-এর মাজারের শিলালিপি, ফারসি, ১২১৪ হিজরি/১৭৯৯-১৮০০ খ্রি.
দায়েম শাহ'র মাজারের দ্বিতীয় শিলালিপি, ফারসি, ১২১৪ হিজরি/১৭৯৯-১৮০০ খ্রি.
মির্জা মান্না দেউড়ি মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২১৭ হিজরি/ ১৮০২-০৩ খ্রি.
শাহ আলী-এর মাজারের দ্বিতীয় শিলালিপি, ফারসি, ১২২১ হিজরি/১৮০৬-০৭ খ্রি.
আলুরবাজর মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২২১ হিজরি/ ১৮০৬-০৭ খ্রি.
আজিমপুর ছোট দায়রা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২২৪ হিজরি/১৮০৯-১০ খ্রি.
জোড়পুল মসজিদের শিলালিপি চব্বিশ জামাদিস সানি ১২২৭ /৪ জুলাই ১৮১২ খ্রি.
শাহ মোহাম্মদীর মাজারের শিলালিপি, ফারসি, ১২৫১ হিজরি/১৮৩৫-৩৬ খ্রি.

আবদুল হাদি লেন মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২২৮ হিজরি/১৮১৩ খ্রি.
নান্নি বিবির মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩১ হিজরি/১৮১৫-১৬ খ্রি.
কুলুটোলা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩২ হিজরি/ ১৮১৬-১৭খ্রি.
শিরিস দাস লেন মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩০ হিজরি/১৮১৬-১৭ খ্রি.
লক্ষীবাজার মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩২ হিজরি/১৮১৬-১৭ খ্রী.
এতিম শাহ-এর মাজারের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩৫ হিজরি/১৮১৯-২০ খ্রি.
সিংটোলা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩৫ হিজরি, ১৮১৯-২০ খ্রি:
নাজিমউদ্দিন রোড শাহী মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৩৭ হিজরি/ ১৮২১-২২ খ্রি.
আশুরি বেগমের মাজারের শিলালিপি, ফারসি, ১২৪৪ হিজরি/ ১৮২৮-২৯ খ্রি.
পাঁচকুড়ি শাহ-এর ওয়াকফ শিলালিপি, ফারসি, ১২৫১ হিজরি, ১৮৩৫-৩৬ খ্রি:
করিম বক্সর সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১২৫৬ হিজরি/১৮৪০-৪১ খ্রি.
মালিটোলা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৫৯ হিজরি, ১৮৪৩-৪৪ খ্রি:
নাজিরাবাজার বড় জামে মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৬৯ হিজরি/ ১৮৫২ খ্রি:
খাজা আলিমউল্লাহ-এর মাজারের শিলালিপি, ১৮৫৪ খ্রি.
মুনসী মুতাসিম বিল্লাহ-এর মাজারের শিলালিপি, ১২৭৩ হিজরি/১৮৫৬-৫৭ খ্রি.
আলী নকী দেউড়ি মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৭৪ হিজরি, ১৮৫৭-৫৮ খ্রি:
রহমতগঞ্জ কারী সাহেবের মসজিদ, ফারসি, ১২৭৬ হিজরি, ১৮৫৯-৬০ খ্রি:
মুহাম্মদ নাজিমের মাজারের শিলালিপি, ফারসি, ১২৮২ হিজরি/১৮৬৫-৬৬ খ্রি:
মীর্জা গোলাম পীরের সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১২৮৩ হিজরি, ১৮৬৬-৬৭ খ্রি:
বব্বু বেগমের মাজারের শিলালিপি ১২৮৫ হিজরি/১৮৬৮-৬৯ খ্রিঃ
আহমদী বেগমের মাজারের শিলালিপি, ফারসি, ১২৯৭ হিজরি/১৮৮২-৮৩ খ্রি:
জব্বু খানম মসজিদের শিলালিপি, উর্দু, ১২৯৭ হিজরি/ ১৮৮২-৮৩ খ্রি:
বেচারাম দেউড়ি মসজিদের শিলালিপি, আরবি ১২৯০হি:/১৮৭৩-৭৪ খ্রি:
বখশীবাজার ছোট মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১২৯২ হিজরী, ১৮৭৫ খ্রি:
মুন্সী ইনায়েত আলী-এর মাজারের শিলালিপি, ১২৯৩ হিজরি/১৮৭৬-৭৭ খ্রি.
খাকী শাহ-এর মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১৩০০ হিজরি, ১৮৮২-৮৩ খ্রি:
আজিমপুর দায়রা শরীফ মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১৩০৪ হিজরি/ ১৮৮৬-৮৭ খ্রি:
নবাব আবদুল গনির মাযারের শিলালিপি, ফারসি, ২৪ আগস্ট, ১৮৯৬ খ্রি:
আজিমপুর দরবার শরিফ মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১৩০৪হি:/১৮৮৫-৮৬ খ্রি:
বাঁশপট্টি মসজিদের প্রথম, ফারসি, ১৩১৫ হিজরি/১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশপট্টি মসজিদের দ্বিতীয় শিলালিপি, উর্দূ ১৮ রমযান, ১৩১৫ হিজরি/১৮৯৭-৯৮ খ্রি.
আজিমপুর দায়রা শরিফের দ্বিতীয় বারান্দার শিলালিপি, ফারসি, ১৩১৮হিজরি/ ১৯০০-০১
নওয়াব আহসানউল্লাহ- এর মাযারের শিলালিপি, ফারসি, ১ পৌস ১৩০৮বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯০১ খ্রি:
নবাববাড়ি কবরস্থানের আরবী শিলালিপি, ১৩২০ হিজরি, ১৯০২-০৩ খ্রি:
আজিমপুর দরবার শরিফ মসজিদের ১ম শিলালিপি, ফারসি, ১৩২২হি:/১৯০৪খ্রি:
আজিমপুর দয়রা শরিফ মসজিদের প্রথম বারান্দার শিলালিপি, ফারসি,১৩২৪হি:/১৯০৬-০৭ খ্রি:
আজিমপুর দয়রা শরিফ হাউজের শিলালিপি, ফারসি, ১৩২৪হি:/১৯০৬খ্রি:
খাজা বদরুদ্দিনের সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮
আজিমপুর দায়রা শরিফ হাউজের শিলালিপি, ফারসি, ১৩২৮হি:/১৯১০
লাল শাহ-এর মাযার, ১৩২৮ হিজরি/১৯১০ খ্রিস্টাব্দ, নাজিমউদ্দিন রোড

নবাববাড়ি কবরস্থানের আরবী শিলালিপি, ১৩২৮ হিজরি
আমিরউদ্দিন দারোগার মসজিদের শিলালিপি, উর্দু, ১৩২৯হি:/১৯১১খ্রি:
নারিন্দা শাহ সাহেববাড়ির মসজিদের প্রথম শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩০ হিজরি/১৯১১-১২ খ্রি.
নারিন্দা শাহ সাহেববাড়ির মসজিদের দ্বিতীয় শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩০ হিজরি/১৯১১-১২ খ্রি.
নরসিং শাহ-এর মাযারের শিলালিপি, ১৩৩৩ হিজরি, ফারসি, ১৯১৪-১৫ খ্রি:
কলিমুলণ্ঢাহ-এর মাযারের শিলালিপি, ১৩৩৭ হিজরি, ফারসি, ১৯১৮-১৯ খ্রি:
শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩০ হিজরি/১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দ
লাল মিয়া কচোয়ানের মসজিদ, ১৩৩২ হিজরী [১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ]
রোকনপুর কাজীবাড়ি মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, হিজরি ১৩৩৩/ ১৯১৪-১৫
আজিমপুর দায়রা শরীফের খালিলুল্লাহ-এর শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩৫ হিজরি, ১৯১৬ খ্রি.
মৌলভীবাজার মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩৭ হিজরি/ ১৯১৮
মাহমুদ আলীর সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১৯২৪ খ্রি:
কলিমউদ্দিনের সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩৯ হিজরি/১৯২০-২১ খ্রি.
নাজিমউদ্দিন রোড শাহী মসজিদের হাউজের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৪০ হিজরি/১৯২১-২১ খ্রি:
ইশরাত বানুর মাযারের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৪৪ হিজরি, ১৯২৫-২৬ খ্রি:
আমেনা বানুর সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১৩৩৩ বাংলা, ১৯২৬ খ্রি:
শাহ সাহেব বাড়ি মাযারের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৪৫ হিজরি/১৯২৬-২৭ খ্রি.
আজিমপুর দায়রা শরীফের মসজিদের মিনারের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৪৭ হিজরি, ১৯২৮ খ্রি:
আয়েশা খানমের সমাধির শিলালিপি, ফারসি, ১৯৩০ খ্রি:
১৯৩৫ সালের ফারসি শিলালিপি, ফারসি, ১৯৩৫ খ্রি:
শাহ সাহেব বাড়ির মাযারের শিলালিপি, ফারসি, ১৩৪৫হি:/১৯২৬-২৭খ্রি:
গোর ই শহীদ মসজিদের ২য় শিলালিপি, উর্দু, ১৯৩৮ খ্রি:
গোর ই শহীদ মসজিদের ৩য় শিলালিপি, উর্দু, ১৯৩৮ খ্রি:
মাহমুদ আলীর মাজারের শিলালিপি, ১৯৪২ খ্রি:
মীর সাইয়েদজানের মাজারের শিলালিপি ৫ রমযান ১৩৬১ হিজরি /১৯৪২ খ্রি.
আজিমপুর দায়রা শরিফের গদি ঘরের শিলালিপি, ফারসি, সময় অজ্ঞাত
আগা মুহাম্মদের মাজারের শিলালিপি, ফারসি, সময় অজ্ঞাত
জিন্দবাজার কামরাঙা মসজিদের শিলালিপি, ফারসি, সময় অজ্ঞাত
আজিমপুর দায়রা শরীফের ৪ টি শিলালিপি, ফারসি, সময় অজ্ঞাত
সংস্কৃত
চণ্ডী দেবীর শিলালিপি, লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল
অটলমণি দেবী স্মৃতিমঠের শিলালিপি, ১৯৩৫ খ্রি.
মধুসূধন শর্মা স্মৃতিমঠের শিলালিপি, ১৯২৬ খ্রি.
বাংলা
ঠাঁঠারিবাজর শিব মন্দিরের শিলালিপি
গৌড়ীয় মঠের ৩টি শিলালিপি
হাটখোলা মঠের দু'টি শিলালিপি
ভগবতী মন্দিরের শিলালিপি
মহাপ্রভূ আখড়া মন্দিরের শিলালিপি
টিএসসির সমাধিসৌধর শিলালিপি

গোয়ালনগর আখড়ার শিলালিপি
বিহারীলাল আখড়ার রক্ষিত শিলালিপি
মহেন্দ্র মন্দিরের শিলালিপি
বীরভদ্রের আখড়ার শিলালিপি
লক্ষীনারায়ন মন্দিরে রক্ষিত শিলালিপি
ফরাসগঞ্জ মন্দিরের শিলালিপি
বাংলা ও ইংরেজি
পোস্তাগোলা গৌরমন্দিরের শিলালিপি
পোস্তাগোলা শ্মশানের গেটের শিলালিপি
মীর আশরাফ আলীর সমাধির শিলালিপি, কার্জন হল

শিলালিপির খোঁজ নেয়া কমিটির চলমান কাজ। কমিটির ধারণা, ভবিষ্যতে আরো শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যাবে- এই তালিকা আরো সমৃদ্ধ হবে। আর্মেনিয়ান গির্জার শিলালিপিসমূহের তালিকা তৈরির পর কমিটি ঢাকার ইউরোপীয় ভাষার শিলালিপির তালিকা প্রকাশ করবে – পরিচালনা পরিষদ

পরিশিষ্ট ঘ

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস গবেষণার জন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের ঘোষণাপত্র

ঢাকার স্থাপত্য গ্রন্থনার কাজে যুক্ত গবেষক, শিল্পী, স্থপতি, সাংবাদিকরা ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়ে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে দু'টি ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। ২০১০ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ঢাকার স্থাপত্য বিয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পৰে প্রথম ঘোষণাটি পাঠ করেন শিল্পী শাহাবুদ্দিন। প্রথম ঘোষণাপত্রে বলা হয়, *কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিতব্য গ্রন্থগুলোর মেধাস্বত্ব প্রাচীন বাংলা বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হবে বলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ এবং প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত (১৭৫৭) বঙ্গের ইতিহাস চর্চা জরুরি বলে বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকার স্থাপত্য প্রকাশনা ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করছি।*

২০১১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভনের সামনে ঢাকার স্থাপত্য বিয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রটি উদ্যোক্তাদের পৰে পাঠ করেন স্থপতি সামসুল ওয়ারেস। দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে বলা হয়, *বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস চর্চা প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকায় স্থাপত্য প্রকাশনা ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণায় ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী বৃত্তি, ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ে রক্ষিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার জন্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বৃত্তি এবং বিদেশি ভাষায় বঙ্গ অঞ্চল নিয়ে লেখা গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের জন্য ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বৃত্তি প্রদান করার প্রত্যয় ঘোষণা করছি।*

প্রাথমিকভাবে উদ্যোক্তারা নিজেরা ন্যূনতম ১০০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে একটি তহবিল তৈরি করছেন। এই তহবিলের ৮০ ভাগ ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের কাজে এবং ২০ ভাগ স্থাপত্য গ্রন্থনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের কাজে ব্যবহৃত হবে। ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য কমিটি এরপর সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, স্বেচ্ছাসেবী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সহায়তা চাইবে।

ইতিমধ্যে কমিটির পক্ষ থেকে সোনালী ব্যাংক লিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখায় 'ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি' নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। যার সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩৪২৪৫৯৮৩। অ্যাকাউন্টটি পরিচালনা করছেন কমিটির চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক এবং ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের অন্যতম দুজন উদ্যোক্তা অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, আনা ইসলাম, শিল্পী শাহাবুদ্দিন এবং শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী। ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা অনুদান প্রদান করেছেন অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, আনা ইসলাম, শিল্পী শাহাবুদ্দিন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, স্থপতি মীর মোবাশ্বের আলী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী, স্থপতি আবু সাঈদ এম আহমদ, অধ্যাপক মাহফুজা খান, অধ্যাপক সামসুল ওয়ারেস, শিল্পী লালারুখ সেলিম, অধ্যাপক ফকরুল আলম, স্থপতি লুভা নাহিদ চৌধুরী, মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দিন ফতেহপুরী, পাভেল রহমান, কাকলী প্রধান, স্থপতি নাজমুল হক খান, সাংবাদিক আলমগীর হোসেন, শিল্পী মৃনাল হক, শিল্পী আনিসুর রহমান, শিল্পী সাঈদা কামাল, সাংবাদিক নাদীম কাদির, জিয়া ইসলাম, ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান, সাংবাদিক সৈয়দ আবদাল আহমদ, মোর্শেদ আলী খান, মুমিত আল রশিদ, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মোহাম্মদ আহসানুল হাদী, নাসির আলী মামুন প্রমুখ।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থনা কর্ম

অ নু বা দ ক

আরবি, ফারসি ও উর্দু

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
আহসানুল হাদী
অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশার
ড. গীতি ফরোজ
ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী
মওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহ্পুরী
মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
ড. মওলানা একেএম মাহবুবুর রহমান
ড. মোহসীন উদ্দিন মিয়া
হাফেজ মোহাম্মদ শোয়াইব
ড. ঈশা শাহেদী
ড. শাহরুখ বেইগি
অধ্যাপক কেএম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক সিরাজুল হক
অধ্যাপক মো: আবু বকর সিদ্দীক
আনিসুর রহমান স্বপন
হাফেজ মুহাম্মদ ছাইফুদ্দিন
কামাল হোসাইন
মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
অধ্যাপক মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান
মুমিত আল রশিদ
মেহেদী হাসান
মিসেস শামীম বানু

ইংরেজি

অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম
অধ্যাপক কাজল বন্দোপাধ্যায়
অধ্যাপক ফকরুল আলম
অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক
স্থপতি রবিউল হুসাইন
অধ্যাপক রাজিয়া খান আমিন
ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও

সংস্কৃত

অধ্যাপক নারায়ণ বিশ্বাস
অধ্যাপক দুলাল কান্তি ভৌমিক

লাতিন

ফাদার সিলভানো গারেল্লো
ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও

আর্মেনীয়

ফাদার হামাজাস্প কেচিচিয়ান

পর্তুগীজ

ফাদার অগস্তো রামোস

আ লো ক চি ত্রী

কাকলী প্রধান
জয়ীতা রায়
সৈয়দ জাকির হোসেন
শওকত জামিল
জিয়া ইসলাম
নাসির আলী মামুন
পাভেল রহমান
ফিরোজ চৌধুরী
শেখ হাসান

শি ল্পী

শিল্পী আইভি জামান
শিল্পী আনিসুর রহমান
শিল্পী আব্দুস সাত্তার
শিল্পী কেজি মুস্তাফা
শিল্পী চন্দ্রশেখর দে
শিল্পী নাইমা হক
শিল্পী ফরিদা জামান
শিল্পী বীরেন সোম
শিল্পী মামুন কায়সার
শিল্পী রণজিৎ দাশ
ভাস্কর রাসা
শিল্পী রোকেয়া সুলতানা
শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী
শিল্পী সাঈদা কামাল
শিল্পী হামিদুজ্জামান খান
শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমদ
শিল্পী মৃনাল হক

অস্থায়ী দপ্তর : ডাকসু ভবন (২য় তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির পরিচালনা পরিষদের সদস্য জয়ীতা রায় কর্তৃক প্রকাশিত।